শেষ বিকেলের মেয়ে

জহির রায়হান



শেষ বিকেলের মেয়ে

আকাশের রঙ্ বুঝি বারবার বদলায়। কখনো নীল। কখনো হলুদ। কখনো আবার টক্‌টকে লাল। মাঝে মাঝে যখন সাদা কালো মেঘগুলো ইতি-উতি ছড়িয়ে থাকে আর সোনালি সুর্যের আভা ঈষৎ বাঁকা হয়ে সহস্র মেঘের গায়ে লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয়, এর রঙ্ একটি নয়, অনেক।

এখন আকাশের কোন রঙ্ নেই।

আছে বৃষ্টি।

একটানা বর্ষণ।

সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে তবু থামবার কোন লক্ষণ নেই। রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। অতি সাবধানে হাঁটতে গিয়েও ডুবন্ত পাথর-নুড়ির সঙ্গে বারকয়েক ধাক্কা খেয়েছে কাসেদ। আরেকটু হলে একটা সরু নর্দমায় পিছলে পড়তো সে। গায়ের কাপড়টা ভিজে চুপসে গেছে। মাথার চুলগুলো বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাসায় এসে পৌঁছলো কাসেদ, তখন জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বোধ হয় ঝড় উঠবে আজ।

প্রচণ্ড ঝড়।

ভেজান দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে কাসেদ দেখলো, ছোট্ট একখানা পিঁড়ির ওপরে বসে চুলোয় আঁচ দিচ্ছে নাহার, মা তসবিহ্ হাতে পাশে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলাপ করছেন ওর সঙ্গে।

ভেতরে আসতে অনুযোগভরা কণ্ঠে মা বললেন, দেখো, ভিজে কি অবস্থা হয়েছে দেখো। কি দরকার ছিলো এই বৃষ্টিতে বেরুবার?

কাসেদ কোন উত্তর দেবার আগেই মা আবার বললেন, ঠাণ্ডা লেগে তুমি একদিন মারা যাবে। এই বলে দিলাম দেখো, তুমি একদিন বৃষ্টিতে ভিজেই মারা যাবে।

কেন মিছেমিছি চিন্তা করছো মা। ভেজাটা আমার গা স'য়া হয়ে গেছে। দেখো কিছু হবে না।

না হবে না। যেদিন অসুখ করবে সেদিন টের পাবে। সহসা কি মনে পড়তে খানিকক্ষণ চুপ থেকে মা শুধোলেন, ছাতাটা করেছো কি শুনি? তাইতো মা, ছাতাটা! কাসেদ ইতস্ততঃ গলায় জবাব দিল, ওটা সেদিন অফিস থেকে এক ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন, তার কাছ থেকে আর আনা হয় নি।

যা ভেবেছিলাম, নাহারের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে মা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোর দিন যাবে কি করে আমায় বলতো? আজ এটা, কাল সেটা তুই শুধু মানুষকে বিলোতে থাকবি। রাজত্বি থাকতো না হয় বুঝতাম। টানাটানির সংসার।

নিজের ঘরে এসে ভেজা কাপড়গুলো দড়ির ওপর ঝুঁলিয়ে রাখলো কাসেদ। আলনা থেকে একটা গেঞ্জি টেনে নিয়ে পরলো। তারপর উনুনের পাশে এসে বললো, বিলোচ্ছি কে বললো মা, ছাতাটা ভদ্রলোক কিছুক্ষণের জন্য চাইলেন তাই দিলাম। ওটা তো চিরকালের জন্য দেই নি, কাল আবার চেয়ে নিয়ে আসব।

মা এই অবসরে তসবিহ গুণছিলেন আর মনে মনে কি যেন পড়ছিলেন তিনি। থেমে বললেন, আনবি যে তা আমি জানি। ক'দিন ক'টা জিনিসি দিয়ে তুই ফেরত এনেছিস শুনি? এইতো, গেলো শীতে তোর বাবার কম্বলটা যে নিয়ে কোন্ এক বন্ধুকে দিলি, আর কি হলো?

কি আর হবে মা। একদিন সে নিজেই এসে ফেরত দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, দিয়ে যেতে ওর বয়ে গেছে। অমন জিনিস কেউ পেলে আর হাতছাড়া করে? লোকটাকে তুমি শুধু শুধু সন্দেহ করছো মা। ও বড় ভালো লোক। হাতজোড়া উনুনের উপর ছড়িয়ে দিলো কাসেদ। একটু গরম হয়ে নিতে চায় সে। মা বললেন, তুই তো দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ভালো বলিস। আজ পর্যন্ত একটা লোককে খারাপ বলতে শুনলাম না। সেদিন মুদী এসে যাচ্ছে-তা' গালাগাল দিয়ে গেলো, তাকে একটা কথা বলেছিলি তুই?

মা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে।

কাসেদ নীরবে আগুন পোহাতে লাগলো।

নাহার এতক্ষণে একটা কথাও বলে নি। চুপচাপ মা-ছেলের ঝগড়া দেখছিলো। সহসা উনুন থেকে মুখখানা তুলে আস্তে করে বললো, তোমার নামাজের সময় হয়ে গেলো মা। মা বললেন, তাই তো! বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন তিনি। চুলোর ওপরে চালগুলো ততক্ষণে ফুটতে শুরু করেছে। ঢাকনিটা তুলে পানির পরিমাণটা দেখে নিলো নাহার।

কাসেদ তখনও চুপ করে আছে।

নীরবে কি যেন ভাবছে সে।

নাহার এক সময় বললো, জাহানারা এসে আজ অনেকক্ষণ বসেছিলেন।

কখন এসেছিল সে? গলাটা যেন সহসা কেঁপে উঠলো তার। নাহার মৃদু গলায় বললো, সকাল বেলা।

কিছু কি বলে গেছে তোমায়? কাসেদের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

নাহার বললো, না, একখানা চিঠি রেখে গেছে।

চিঠিটা কোথায়?

আপনার টেবিলের ওপর রাখা আছে। ঘাড় নিচু করে আবার আপন কাজে মন দিল নাহার। চোখ জোড়া তুলে এক নজর কাসেদের দিকে তাকালে সে হয়তো দেখতে পেতো সারা মুখ তার লাল হয়ে গেছে।

উনুনের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে এনে পরক্ষণে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ। দ্রুতপায়ে নিজের কামরায় এসে টেবিলের দিকে তাকালো সে। চিঠিখানা একাটা বইয়ের নিচে চাপা দিয়ে রাখা। মুহূর্তে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে ভিড় জমালো। চিঠিতে কি লিখেছে জাহানারা? আর কেনই বা এসে এতক্ষণ বসেছিলো সে? কাল বিকেলে নবাবপুরে দেখা হয়েছিলো ওর সঙ্গে। অনেকক্ষণ কথাও বলেছিলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভোর না হতে আবার সে বাসায় আসলো কেন? বাসায় অবশ্য প্রায় আসে জাহানারা? কাসেদ না থাকলে মায়ের সাথে বসে বসে গল্প করে। কথা বলে। খামের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে পড়লো কাসেদ।

জাহানারা লিখেছে–

অনেকক্ষণ বসেও আপনাকে না পেয়ে অবশেষে চলে যাচ্ছি। বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

সময় করে একবার বাসায় আসবেন কিন্তু। আপনাকে আমার বড় দরকার।

চিঠিটা বারকয়েক পড়লো কাসেদ। বিশেষ করে শেষের লাইনটা। সেখানে যেন একটু অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া রয়েছে। আন্তরিকতার স্পর্শ। কাগজটা আবার ভাঁজ করে বইয়ের মধ্যে রেখে দিল সে। তারপর নীরবে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে এখনো ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে।

সরু গলিটায় একটা মানুষও নেই।

সবাই ঘরে খিল এঁটে ঘুমোবার আয়োজন করছে এখন। কিম্বা, বিছানায় বসে বসে গল্প করছে, রূপকথার গল্প।

কাসেদ ভাবলো আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেলে এখনই সে জাহানারাদের ওখানে যেতে পারতো। প্রয়োজনটা জেনে নেয়া যেতো ওর কাছ থেকে। নইলে রাতটা বড় উৎকণ্ঠায় কাটবে।

কেন যেতে লিখেছে জাহানারা?

জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানায় বসলো কাসেদ।

ওর মনে এখন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দু'চোখে স্বপ্নের আবির ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ।

অর্থের প্রতি তার লোভ নেই। একগাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসীবাঁদীর স্বপ্নও সে দেখে না।

ছোট্ট একটা বাড়ি থাকবে তার, শহর নয়, শহরতলীতে, যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে দু'পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা।

সকাল কিম্বা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকবে না। নিরালা পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা, কথা বলবে।

আজকের বিকালটা বড় সুন্দর, তাই না?

কালও এমনটি ছিলো।

চিরকাল যদি এমনটি থাকে?

তাহলে বড় একঘেয়ে লাগবে। সহসা শব্দ করে হেসে উঠবে জাহানারা। হয়তো বলবে, একটানা সুখ আমি চাই না, মাঝে মাঝে দুঃখেরও প্রয়োজন আছে; নইলে সুখের মূল্য বুঝবো কেমন করে?

ওরা কথা বলবে।

আরো অনেক কথা।

কখনো কানে কানে, কখনো মনে মনে, কখনো নীরবে।

তারপর রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে আসবে ওরা।

সামনের বাঁকানো বারান্দায় বেতের টেবিলের ওপর দু'কাপ চা রাখা। গরম চায়ের উত্তাপ যেন বার বার দেহকে স্পর্শ করছে এসে।

বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবে ওরা।

কি ভাবছো?

কিছু না।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি?

তোমার কপালে যদি একটা তারার টিপ পরিয়ে দিতে পারতাম।

কাসেদ লক্ষ্যও করেনি কখন নাহার এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে।

ওর হাতের চুড়ির শব্দে সহসা যেন সম্বিত ফিরে পেলো সে।

নাহার বললো, উঠুন চাদরটা ভালো করে বিছিয়ে দিই।

ও। সরে এসে টেবিলের সামনে বসলো কাসেদ।

এলোমেলো চাদরটা তুলে নিয়ে ভালো করে বিছিয়ে দিচ্ছে নাহার। ছিপছিপে দেহ ময়লা রঙ্ আর মিষ্টি চেহারার নাতিদীর্ঘ মেয়েটি বড় কম কথা বলে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও কোন সময় মুখ দিয়ে বেরুবে না তার। আচ্ছা নাহার, ও এখানে কতক্ষণ বসেছিল?

কে? নাহার অবাক চোখে তাকালো।

কাসেদ অপ্রস্তুত স্বরে বললো, জাহানারার কথা বলছি।

নাহার অস্পষ্ট গলায় বললো, অনেকক্ষণ!

অনেকক্ষণ! কাসেদ চুপ করে গেলো?

পাশের ঘর থেকে মায়ের কোরান শরীফ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেনে টেনে সুর করে পড়ছেন তিনি। রোজ পড়েন। সকালে, দুপুরে আর রাতে। মাসে একবার করে কোরান শরীফ খতম করা চাই, নাইলে উনি শান্তি পান না। রাতে ভাল করে ঘুমও হয় না তাঁর।

মাঝে মাঝে কাসেদ বলে, মা, এত পুণ্য দিয়ে তুমি করবে কি শুনি?

মা হেসে জবাব দেন, একি শুধু আমার নিজের জন্যে-রে, তোদের জন্যে নয়? বলতে গিয়ে সহসা মায়ের মুখখানা ম্লান হয়ে আসে। হয়তো মৃত স্বামীর কথা সে মুহূর্তে মনে পড়ে তাঁর। বাবা ছিলেন একেবারে উল্টো মেরুর মানুষ। ভুলেও কোনদিন ধর্ম-কর্মের ধার ধারতেন না তিনি। একবেলা নামাজ কিম্বা একটা রোজাও কখনো রাখেন নি।

মা কিছু বলতে গেলে উল্টো ধম্‌কে উঠতেন, বলতেন ওসব বাজে কাজে সময় ব্যয় করার ধৈর্য আমার নেই।

মা আহত হতেন। কিন্তু সাহস করে আর কিছু বলতেন না।

বাবা মারা গেছেন, আজ কতদিন। আজও রাত জেগে মা বাবার জন্যে প্রার্থনা করেন। কান্নাকাটি করেন খোদার কাছে। বলেন, ওকে তুমি মাফ করে দিও খোদা, ওর সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিও।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, বিছানাটা সুন্দর করে বিছিয়ে দিয়ে নাহার ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। রান্নাঘরে বোধ হয় খাওয়ার আয়োজন করছে সে এখন।

বইটা খুলে জাহানারার চিঠিখানা আবার বের করলো কাসেদ।

হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার আর ঝকঝকে।

জাহানারা, আমি তোমাকে ভালবাসি জাহানারা!

জাহানারা নীরব।

চোখজোড়া মাটিতে নামিয়ে নিয়ে কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে।

সারা মুখে ঈষৎ বিস্ময়।

সারা দেহ উৎকণ্ঠায় কাঁপছে তার। সন্দেহ আর সম্ভাবনার দোলায় দুলছে তার মন!

কাসেদ ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমায় ভালবাস না জাহানারা?

জাহানারার ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে এক টুকরো হাসি জেগে উঠলো।

ধীরে ধীরে সে হাসি চোখে আর চিবুকে ছড়িয়ে পড়লো তার। লজ্জায় মাথাটা নত হয়ে এলো। মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে সে বললো, তুমি কি কিছুই বোঝ না?

কাসেদ নীরব।

মুহূর্তের আনন্দে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দীর্ঘ সময় ধরে সে দিনে রাতে যাকে নিয়ে অশেষ কল্পনার আলপনা বুনতো, সে আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে।

জাহানারা! মিষ্টি করে সে ডাকলো।

বলো। চোখ তুলে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করছে মেয়েটি।

কাসেদ বললো, তুমি আমাকে আজ বড় অবাক করলে।

কেন?

আমি ভাবতেও পারি নি তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো।

অমন করে ভাবতে গেলে কেন?

জানি না। শুধু জানি এ প্রশ্ন বার বার আমাকে যন্ত্রণা দিতো। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। জাহানারা কাছে সরে এসে একখানা হাত রাখলো ওর নরোম তুলতুলে চুলের অরণ্যে। তারপর ধীরে ধীরে সিঁথি কাটতে কাটতে মৃদু গলায় সে বললো, থাক। ওসব কথা এখন থাক, অন্য কিছু বলো।

কাসেদ ওর চোখে চোখ রেখে আস্তে করে শুধালো, কি বলবো?

কিরে বিড়বিড় করে কি-সব বকছিস তুই? মায়ের কণ্ঠস্বর তীরের ফলার মত কানে এসে বিঁধলো তার। কাসেদ চম্‌কে উঠে বসলো।

মা ওর মাথার ওপর একখানা হাত রেখে আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল অমন করে তুই কি ভাবিস বলতো?

কাসেদ ইতস্ততঃ করে বললো, ও কিছু না মা, চলো ভাত দেবে এখন, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

মা ভর্ৎসনা করে বললেন, ক্ষিধে পেয়েছে এতক্ষণ বলিস নি কেন, চল, খাবি চল। ওঠ, মুখহাত ধুয়ে নে। বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রান্না ঘরে নাহার এখন খাবার সাজাচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি এখনো থামে নি।

বাতাস বেড়েছে আরো।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে জাহানারাদের বাসায় গেলো কাসেদ।

বাসাটা ওদের পুরানা পল্টনে। একতলা বাড়ি সদ্য চুনকাম দে'য়া।

সামনে বাগান। বসে বিকেলে ওরা চা খায়, গল্প করে।

পথে যেতে যেতে কাসেদ ভাবলো, জাহানারা হয়তো তার অপেক্ষায় এতক্ষণে অধীর হয়ে আছে। ঘর ছেড়ে বারবার বারান্দায় বেরিয়ে আসছে সে। চেয়ে চেয়ে দেখছে লোকটা আসছে কিনা। সে কি আসবে না আজ? পাতলা কপালে সরু সরু রেখা এঁকে শোবার ঘরে সরে গেলো জাহানারা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানা দেখলো সে। বড় ম্লান মনে হচ্ছে আজ। কিছুই ভাল লাগছে না। মন বসতে চাইছে না কোন কাজে। বিকেল হয়ে গেলো, কাসেদ এখনো আসছে না। কেন? ভাবতে বড় ভালো লাগলো ওর। মনটা খুশীতে ভরে গেলো। জাহানারা কি সত্যি ওকে ভালবাসে?

বাসার কাছে এসে কাসেদ দেখলো সামনের বাগানে অনেক লোকের ভিড়। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে। দেখে অবাক হলো সে। সবার পরনে সদ্য ধোয়ান কাপড়। হাসছে। কথা বলছে। মাঝে মাঝে চানাচুর আর ডারমুট খাচ্ছে। একখানা পিরিচ হাতে অনেকগুলো মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জাহানারা। আজ সুন্দর করে সেজেছে সে। পরনে হালকা নীল রঙের শাড়ি। চুলগুলো খোঁপায় বাঁধা। চারপাশে তার সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কপালে কুমকুমের টিপ। কাসেদকে দেখতে পেয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো জাহানারা।

আপনি এলেন তাহলে?

একমুখ হেসে বললো সে।

হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়।

সরু সরু দাঁতগুলো মুক্তোর মত চিক্‌চিক করে ওঠে।

কাসেদ শুধালো, না আসার কোন হেতু ছিলো কি? যাক্‌গে, বাড়িতে এত অতিথির ভিড় কেন?

জাহানারা জিভ কেটে বললো, ওমা আপনি জানেন না বুঝি, আজ আমার জন্মদিন।

জানবো কি করে বলুন। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো কাসেদ।

জাহানারা পরক্ষণে বললো, তাইতো আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কিছু মনে করেন নি তো?

না. এতে মনে করার কি আছে? নিজেই যেন লজ্জা পেলো কাসেদ।

জাহানারা বললো, আসুন কিছু মুখে দিন, চা খাবেন, না কোল্ড ড্রিঙ্ক? কথাগুলো কাসেদের কানে পৌঁছালো কি-না, বোঝা গেলো না। মুহূর্তে সে বিব্রত বোধ করলো।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, অনেকগুলো চোখের দৃষ্টির মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে।

জাহানারা আবার বললো, দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।

কাসেদ ইতস্ততঃ করে শুধালো, আমায় ডেকেছেন কেন বললেন না তো? ভ্রূজোড়া তুলে জাহানারা বললো, ও হ্যাঁ, সে পরে আলাপ করা যাবে। আগে কিছু খেয়ে নিন। অফিস থেকে এসেছেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পথে কিছু খান নি, তাই না?

কাসেদের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো, কিছু বলতে চেষ্টা করলো সে, পারলো না। দু'টি মেয়ে দলছাড়া হয়ে জাহানারার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলো তাকে।

জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আসুন এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার। মিলি চৌধুরী। আমার অনেক কালের বান্ধবী, ইডেনে পড়ে। আর এর নাম শিউলি, আমার কাজিন।

আর ইনি হলেন কাসেদ আহমেদ। নাম হয়তো শুনে থাকবে তোমরা, কবিতা লেখেন।

মিলি আর শিউলি হাত তুলে আদাব জানালো। পরিমিত হাসলো দু'জনে। মিলি জানতে চাইলো, আপনি কি ধরনের কবিতা লেখেন?

কাসেদ বললো, লিখি না, লিখতাম এককালে।

ইতিমধ্যে জাহানারা সরে গেছে সেখান থেকে। অদূরে কয়েকটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সে।

শিউলি শুধালো, আপনার কোন বই বেরিয়েছে?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

মিলি বললো, আসুন বসা যাক।

বাগানের এক কোণে তিনখানা বেতের চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসলোা ওরা।

কাসেদ নীরব।

মিলি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

শিউলি মিটিমিটি হাসছে।

দোহারা গড়ন। ময়লা রঙ্। লম্বা মুখের উপর নাকটা বড় ছোট হলেও বেমানান মনে হয় না। চোখের নিচে সরু একটা কাটা দাগ। ভ্রূতে সুরমা টানা। কাসেদের মুখের ওপরে চঞ্চল চোখজোড়া মেলে ধরে হাসছে সে। অস্বস্তিতে মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিলো কাসেদ।

আড়চোখে মেয়েটিকে আরেকবার দেখলো সে।

এখনো তাকিয়ে মেয়েটি।

এখনো।

সহসা মিলি শুধালো, আপনি কোথায় থাকেন, কাসেদ সাহেব?

কাসেদ মৃদু গলায় বললো, কল্‌তাবাজারে।

বাসায় কে আছেন আপনার?

মা আছেন আর এক দূরসম্পর্কীয়া বোন।

শিউলি হাসছে, হাসুক।

জাহানারা এখনো এলো না। একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সে। ওদের কথা যেন ফুরোবে না কোনদিন।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো কাসেদ।

এ কি বলছেন আপনি? জাহানারা অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে।

মৃদু গলায় বললো, আপনাকে ভালবাসার কথা কোনদিন ভুলেও ভাবিনি আমি।

কোনদিনও না জাহানারা? কাতর কণ্ঠে শুধালো সে।

কিন্তু কেন, কেন বলতে পার? সহসা তার কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনালো। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাসেদ বললো, যাকে এত কাছে ঠাঁই দিয়েছো, তাকে আরো কাছে টেনে নিতে এত ভয় কিসের?

ভয়? আমি তো ভয়ের কথা বলিনি।

তবে কেন তুমি ভালবাসবে না আমায়?

ভালো লাগে না বলে।

সহসা সুরেলা কণ্ঠে হেসে উঠল জাহানারা।

না জাহানারা নয়, শিউলি। শিউলি হাসছে এখনো, আপনি মনে মনে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলেন কাসেদ সাহেব? শিউলি শুধালো।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, কই, নাতো। আপনি কি করে বুঝলেন কথা বলছি।

আমি সব বুঝি। আস্তে করে বললো সে। বলে অন্য একটা টেবিলে সরে গেল সে।

মিলি তার ব্যাগ থেকে কাঁটা আর উল বের করে আপন মনে মোজা বুনছে। কাসেদের চোখে চোখ পড়তে মৃদু গলায় বললো, মেয়ের জন্য।

আপনার মেয়ে আছে বুঝি? বোকার মত প্রশ্ন করে বসলো কাসেদ।

মিলির মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো, হ্যাঁ বড্ড দুষ্টু। খালি পায়ে হেঁটে কেবল ঠাণ্ডা লাগায়।

আবার মোজা বোনায় মন দিলো মিলি।

কাসেদ নীরব।

এই একা বসে থাকতে বড় বিরক্তি লাগছে ওর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

ওর দিকে চোখ পড়তে জাহানারা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো সামনে।

একি, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?

বসে বসে আর কি করবো বলুন। জাহানারাকে চুপ থাকতে দেখে কাসেদ আবার বললো, কেন ডেকেছিলেন বললেন না তো?

ও হ্যাঁ, জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আমি সেতার শিখবো ঠিক করেছি। একজন মাস্টার দেখে দিতে পারেন?

কাসেদ বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

এই বুঝি জাহানারার একান্ত প্রয়োজনীয় কথা? এরই জন্যে বাসায় যাওয়া আর অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকা।

কাসেদ হতাশ হলো।

জাহানারা বললো, চুপ করে রইলেন যে।

কাসেদ বললো, না ভাবছিলাম আপনার হঠাৎ সেতার শেখার সখ হলো কেন?

জাহানারা বললো, এমনি।

কাসেদ বললো, বেশ মাষ্টার না হয় আপনাকে ঠিক করে দেবো, কিন্তু– কিন্তু কি?

কিছুদিন পরে আবার ছেড়ে দেবেন না তো?

দেখুন, সারা দেহে দৃঢ়তা এনে জাহানারা বললো, আমি এক কথার মেয়ে।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, বেশ শুনে সুখী হলাম। এখন চলি তা'হলে। আবার দেখা হবে।

জাহানারা বললো, যাবেন? আচ্ছা বলে আবার সেই ছেলেমেয়েদের জটলার দিকে এগিয়ে গেল সে।

কাসেদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, জন্মদিনের আসরে আগত ছেলেদের, মেয়েদের, বুড়ো বুড়ীদের। তারপর যখন সে বাইরে বেরুতে যাবে এমনি শিউলি পেছন থেকে ডাকলো। চলে যাচ্ছেন বুঝি?

কাসেদ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

শিউলে ঠোঁট কেটে বললো, যাবার আগে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া উচিত ছিলো তাই নয় কি?

কাসেদ লজ্জা পেলো। ইতস্ততঃ করে বললো, বড় ভুল হয়ে গেছে, আর আপনারাও সবাই কথা বলছিলেন কিনা, তাই। আচ্ছা এখন চলি।

দাঁড়ান। কাসেদকে অবাক করে দিয়ে শিউলি পরক্ষণে বললো, আমিও বাসায় ফিরবো ভাবছি। চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। দু'হাতে পরনের শাড়িটা আলতো করে গুটিয়ে নিলো শিউলি। খোঁপাটা দেখলো ঠিক আছে কিনা, তারপর কাসেদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো সে। কিছুদূর পথ ওরা নীরবে হেঁটে এলো পাশাপাশি। শিউলি কোথায় যাবে কাসেদ জানে না। কোথায় বাসা ওদের সে প্রশ্নও করে নি সে। শুধু জানে, জাহানারার কাজিন শিউলি।

শিউলি আজ বিকেলে ওর সঙ্গে পথ হাঁটছে।

আরো অনেক পথ পেরিয়ে এসে সহসা কাসেদ শুধালো, আপনি কোন দিকে যাবেন?

কেন, যেদিকে আপনি যাচ্ছেন। শিউলি নির্লিপ্ত।

কাসেদ ঢোক গিলে বললো, আমি এখন বাসায় যাবো।

বেশ তো চলুন না। দু'চোখে হাসি ছড়িয়ে শিউলি বললো, আমাকেও বাসায় ফিরতে হবে। একটুকাল থেমে সে আবার যোগ করলো, আপনাদের খুব কাছাকাছি থাকি।

কাসেদ অবাক হলো, তাই নাকি? কই, বলেন নি তো?

এইতো পরিচয় হলো, বলবার সুযোগ দিলেন কোথায়? শিউলে মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

কাসেদ কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলো।

ওরা তখন স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এসে গেছে।

রাত নামছে ধীরে ধীরে।

বিজলী বাতিগুলো জ্বলছে মিটিমিটি।

চারপাশের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে। খেলার মাঠের সামনেকার গোল চত্বরটিতে লোকজন বসে বসে গল্প করছে। খেলার গল্প। সিনেমার গল্প। আর মাঝে মাঝে চিনেবাদাম কিনে খাচ্ছে ওরা।

সহসা হেসে বললো শিউলি, আচ্ছা আমরা এভাবে হাঁটছি কেন বলুন তো?

একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেলেই তো পারি।

একটু পরে একখানা রিক্সায় চড়ে বসলো ওরা।

একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে রিক্সায় চড়ার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। তাই বারবার অস্বস্তি বোধ করছিলো কাসেদ। কপালে মৃদু ঘাম জমছিলো এসে; বারবার ওর কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করছিলো সে। ওর অবস্থা লক্ষ্য করে শিউলি ঠোঁট টিপে হাসলো, আপনি ভয় পাচ্ছেন বুঝি?

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, কই, নাতো?

তাহলে অমন করছেন কেন?

না, এমনি। লজ্জা কাটিয়ে ওর সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

আছেন।

মা?

আছেন।

বাবা কি করেন?

সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো শিউলি। অতসব জানতে চাইছেন কেন বলুন তো? বিয়ের সম্বন্ধ পাঠাবার চিন্তা করছেন বুঝি?

শিউলি ঝুঁকে তাকালো ওর মুখের দিকে।

ওর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলো কাসেদ।

হঠাৎ সে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলো।

শিউলি আস্তে করে বললো, রাগ করলেন তো? করুন। এমনি সবাই আমার ওপর রাগ করে। আপনি অবশ্য ওদের সবার মত কিনা জানি না। ক্ষণকাল থেমে শিউলি আবার বললো, জানেন, আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি। ওরা অনেকেই আপনার বয়েসি। কেউবা ছোট। কেউ আরো বড়ো। ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই মিশতাম আমি। আপনি হয়তো বলবেন, এ দেশে পুরুষে মেয়েতে বন্ধুত্ব চলতে পারে না। আমি বলবো, ওটা ভুল। ওটা আপনাদের মনের সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে আমরা দু'জন এক রিক্সায় চড়ে বাসায় ফিরছি। লোকে দেখে কত কিছুই না ভাবতে পারে। কিন্তু আমি জানি, আমাদের মনে কোন দুর্বলতা নেই।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

শান্ত শিশুর মত নীরবে শিউলির কথাগুলো শুনছে সে। গাল বেয়ে মৃদু ঘাম ঝরছে তার।

বড় রাস্তা পেরিয়ে রিক্সাটা গলির মধ্যে ঢুকলো।

শিউলি বললো, জানেন? ওরা কেউ আমার বন্ধুত্বের মূল্য দিতে পারে নি। কিছুদিন মেলামেশার পরেই ওদের ব্যবহার যেন কেমন পাল্টে যেতো। আমার চোখেমুখে চেহারায় কি যেন খুঁজে বেড়াতো ওরা। আমি দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম না। তারপর–। বলতে গিয়ে আবার হেসে উঠলো শিউলি। তারপর যা আশঙ্কা করতাম তাই হতো। ওরা প্রেম নিবেদন করে বসতো আমায়। কি বিশ্রী ব্যাপার দেখুন তো। কাসেদের মুখের দিকে তাকালো শিউলি। ওর চেহারায় কি প্রতিক্রিয়া হলো তাই হয়তো লক্ষ্য করছিলো সে।

কাসেদ নীরব।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, আপনার বয়স কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই। ওরা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু শিউলির চোখেমুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। যেন এমনি প্রশ্নের সঙ্গে সে বহুদিন থেকে পরিচিত। বহুবার তাকে এর জবাব দিতে হয়েছে। তাই পরক্ষণে শিউলি বললো, অত্যন্ত সহজভাবেই বললো, বয়স জানতে চাইছেন কেন, ভাবছেন বুঝি আমি অল্প বয়সে পেকে গেছি?

কাসেদ বললো না, ঠিক তার উল্টো। বয়স হলে কি হবে আপনি আসলে এখনও বাচ্চা রয়ে গেছেন।

শিউলি মুহূর্ত কয়েক স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। যেন এর আগে এমনি উত্তর সে শোনে নি কোনদিন।

ওকে চুপ থাকতে দেখে কাসেদ জিজ্ঞেস করলো, চুপ করে গেলেন যে? কি ব্যাপার, রাগ করেন নি তো?

রাগ? অপূর্ব ভঙ্গি করে শিউলি জবাব দিলো, আপনি আমার কে যে আপনার উপর রাগ করবো?

কাসেদ বেশ বুঝতে পারলো, এ মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় সে পেরে উঠবে না। তবু শিউলিকে ভাল লাগলো ওর।

বেশ মেয়ে।

বড় সরল মেয়ে শিউলি।

কিছুক্ষণের পরিচয়ে বড় সহজ হয়ে এসেছে সে। যে কথাগুলো সকলকে বলা যায় না, তাও সে বলেছে ওকে।

জাহানারা যদি শিউলির মত হতো? কাসেদ ভাবলো নীরবে।

শিউলি বললো, আমার আর সব বন্ধুরা যদি আপনার মতো হতো তাহলে বড় ভালো হতো, তাই না কাসেদ সাহেব?

কাসেদ বললো, আমি আপনার বন্ধুদের কোনদিন দেখিনি সুতরাং তাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারছিনে। তবে, আমাকে কেন যে আপনি আদর্শ বন্ধু বলে ভাবছেন তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। একি আপনার উচিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই হচ্ছে। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জবাব দিলো শিউলি। আজকাল আর মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আপনাদের মত পুরুষের চোখের দিকে তাকালেই মনের ভাষা পড়ে নিতে পারি আমি। বুঝতে পারি, লোকটা কেমন।

শিউলি থামলো।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, অল্প বয়সে দেখছি অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার।

অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই হয়। শিউলি গম্ভীর গলায় জবাব দিলো। তবে কেউ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়, কেউ নেয় না।

আপনি কোন দলে?

শিউলি বলল, প্রথমোক্ত।

কাসেদ বলল, তাহলে নতুন কোন পুরুষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব না করাই উচিত।

আস্তে ঠিক হলো না, শিউলি পরক্ষণেই বললো, বলুন, পুরুষটিকে যাচাই করে নিয়ে তারপর বন্ধু বানানো উচিত।

আমাকে যাচাই করেছেন কি?

অবশ্যই।

কখন করলেন?

আপনার অজান্তে। মুখ টিপে হাসল শিউলি। আমার বাসা এসে গেছে এখানে নামতে হবে আমায়।

রিক্সাটা থামিয়ে ছাই রঙের একটা দোতলা বাড়ির সামনে নেমে পড়লো শিউলি। বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো সে। বললো, আবার দেখা হবে। সময় করে একবার আসুন আমাদের বাসায়। কাল কিম্বা পরশু।

কাসেদ সংক্ষেপে বলল, আসবো।

রিক্সা থেকে মুখ বের করে ওদের বাসাটা ভালো করে দেখে নিলো সে। দেখলো একটা বুড়ো দোতলার বারান্দায় নীরবে দেখছে ওদের।

বাসায় এসে একবার জাহানারা ও শিউলির কথা ভাবলো কাসেদ। দু'টি মেয়েতে কি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

জাহানারাকে সে আজ অনেক দিন ধরে চেনে।

কতদিন সে গেছে ওদের বাসায়।

সেও এসেছে এখানে।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছে ওরা, তর্ক করেছে ইকবালের দর্শন নিয়ে। রবি ঠাকুরের কবিতা নিয়ে।

মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত আলোচনার আশেপাশে এলেও গভীরে যায়নি কোনদিন। ইচ্ছে করেই যেন এড়িয়ে গেছে জাহানারা।

হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে টেবিলের উপর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে বসলো কাসেদ। কবিতা লিখবে। বহুদিন কিছু লেখা হয় নি।

পাশের ঘরে ছোট খালুর সঙ্গে কথা বলছেন মা।

তাদের কথাগুলো এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কাসেদ।

মা বললেন, ওদের দু'জনকে নিয়েই তো আমার যত দুশ্চিন্তা। নিজের জন্যে ভাবিনে। বুড়ো হয়ে গেছি। কাল বাদে পরশু একদিন কবরে যেতে হবে।

খালু বললেন, 'সব বুড়ো-বুড়িদেরই ওই এক চিন্তা বড়বু', ছেলেমেয়েদের একটা কিছু হিল্লে হোক। দু'পয়সা রুজি-রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াক ওরা। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি।

মা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হঠাৎ বললেন, নাহারের জন্যে একটা ছেলে দেখে দাও না। বয়স তো ওর কম হলো না।

খালু বললেন, 'আজকাল ছেলে পাওয়া বড় ঝকমারি বড়বু'। ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলে, সেও আবার ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে চায়, বুঝলেন না?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললেন, মেয়ে আমার ম্যাট্রিক পাশ নয় সত্যি, কিন্তু ঘরকন্নায় ওকে কেই হার মানাতে পারবে না। ক্ষণকাল নীরব থেকে মা আবার বললেন, কি যে হয়েছে আজকাল কিছু বুঝিনে, আমাদের জামানায় লোকে দেখতো মেয়ে কেমন রান্নাবান্না করতে পারে।

'সে জামানা পুরোনো হয়ে গেছে বড়বু'। এখন লোকে লেখাপড়া না জানা বউ-এর কথা চিন্তাও করতে পারে না।

খালু থামলেন।

অনেকক্ষণ ওদের কোন কথাবার্তা শোনা গেল না।

হয়তো এখনো মনে মনে নাহারের কথা চিন্তা করছেন মা।

কাসেদের আপন বোন নয় নাহার।

মায়ের দূর সম্পর্কীয় এক খালাতো বোনের মেয়ে। ছোটবেলায় ওর মা মারা যান। ওর বাবা তখন কি একটা কোম্পানীতে চাকরি করতেন।

স্ত্রীকে হয়তো বড় ভালবাসতেন তিনি, তবুও কিছুদিন পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মিলিটারীতে চলে যান। নাহারকে রেখে যান মায়ের কাছে। মাঝে মাঝে চিঠি আসতো।

কখনো মাদ্রাজ থেকে। কখনো পেশোয়ার থেকে। কখনো কানপুর।

শেষ চিঠি এসেছিলো আরাকান থেকে।

তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কেউ বলেছে যুদ্ধে মারা গেছে।

কেউ বলেছে, জাপানীরা ধরে নিয়ে গেছে টোকিওতে।

লড়াই শেষ হলো।

সন্ধি হলো শত্রু-মিত্রে।

তারপর আরো কত বছর গেলো নাহারের বাবা আর ফিরে এলেন না।

মা বলতেন, আমার কোন মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে। তোকে মানুষ করে বড় ঘরে বিয়ে দেবো আমি। তোর ঘরের নাতি-পুতি দেখবো, তবে মরবো।

বাবা বলতেন, বেশ হলো, এতদিনে মেয়ের সখ মিটলো তোমার।

মা বলতেন, মিটবে না। খোদার কাছে কত কেঁদেছি, কত বলেছি আমায় একটা মেয়ে দাও। দেখলেতো, খোদার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। তবু তুমি এক বেলা নামাজ পড় না। কেন পড় না বলতো? তোমার কি পরকালের একটুও ভয় হয় না?

আবার ইহকাল পরকাল নিয়ে এলে কেন বলতো? বাবা ক্ষেপে উঠতেন, বেশ তো কথা হচ্ছিলো।

মা ম্লান হেসে বলতেন, নামাজের নাম নিলেই তোমার গায়ে জ্বর আসে কেন বলতে পারো?

বাবা কিছু বলতেন না, শুধু সরোষ দৃষ্টিতে এক পলক তাকাতেন মায়ের দিকে। মা আফসোস করে বলতেন, তুমি আমাকে দোজখে না নিয়ে ছাড়বে না। বাবা নির্বিকার গলায় জবাব দিতেন, বেহেস্তের প্রতি অমার লোভ নেই। তোমার যদি থেকে থাকে তুমি যেও, আমি তোমার পথ আগলে দাঁড়াবো না। এরপর মা থেমে যেতেন, অবুঝ স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক তা তিনি ভালো করেই জানতেন।

সামনে খোলা খাতাটার দিকে চোখ পড়তেই কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। কবিতা লিখতে বসে খাতার মধ্যে এতক্ষণ সব কি লিখছে সে? ইকবাল, জাহানারা, বিয়ে, নাহার, মিলিটারী, কানপুর, নামাজ, শিউলি। একটার পর একটা হিজিবিজি লেখা। সাদা কাগজটা আরো অনেক শব্দের ভারে ভরে উঠছে। খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিলো কাসেদ।

দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখলো, নাহার দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার কিছু বলবে?

নাহার বললো, মা ডাকছেন। বলে চলে গেল সে।

মা তখনো গল্প করছিলেন খালুর সঙ্গে। খালু একটা মোড়ার ওপর বসে। মা চৌকির ওপর পা ছড়িয়ে খালুর পান বানাচ্ছেন, আর কি যেন আলাপ করছেন।

নাহার একপাশে দাঁড়িয়ে।

কাসেদ আসতে মা বললেন, বস।

খালু বললেন, তুমি কি সেই কেরানীগিরির চাকরিটা এখনো আঁকড়ে রেখেছো নাকি?

কাসেদ সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ।

খালু বললেন, অন্য কোথায় ভালো দেখে একটা কিছু পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা-চরিত্র করো। এ দিয়ে কতদিন চলবে।

খালু নিজে এককালে কেরানী ছিলেন; তাই কেরানীগিরির বেদনা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

কাসেদকে চুপ থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, ধোপার গাধা আর কোম্পানীর অফিসের কেরানীর মধ্যে পার্থক্য নেই বুঝলে? এতে না আছে কোন রোজগার, না আছে সম্মান।

কাসেদ বললো, তিনজন মানুষ আমরা, এ রোজগারেই চলে যাবে।

টাকা টাকা করে, টাকা দিয়ে করবো কি?

মা বললেন, শোন, ছেলের কথা শোন। যেন সংসার এই থাকবে। ঘরে আর বউ ছেলে আসবে না। বলি তুই এমন হলি কি করে বলতো, তোর বাবা তো এমনটি ছিলেন না। কাসেদ কোন উত্তর দেবার আগেই খালু বললেন, 'এ নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না বড়বু'। মাথায় বোঝা চাপলে আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলে পান খাওয়া দাঁতগুলো বের করে একগাল হাসলেন তিনি। নাহার হঠাৎ বললো, মা ভাত দেবো?

মা ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, তাইতো, কথায় কথায় দেখছি অনেক রাত হয়ে গেছে। যাও ভাত বেড়ে না ও, তোমার খালুও এখানে খাবেন।

খালু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না বড়বু, আমি বাসায় গিয়ে খাবো। ওরা সবাই বসে থাকবে।

মা হেসে বললেন, মেয়ে আসছে বেড়াতে, বাসায় নিশ্চয়ই খুব ভালো পাক-শাক হচ্ছে। আমাদের এখানে ডাল-ভাত কি আর মুখে রুচবে?

কি যে বলেন বড়বু, খালু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বাসায় কি আর আমরাও কোর্মা পোলাও খাই, ডাল ভাত সব জায়গায়। এখন চলি, আরেক দিন এসে খেয়ে যাবো। যাবার উদ্যোগ করতে করতে আবার থেমে গেলেন খালু। কাসেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সালমা এসেছে ঢাকায়। বড়বু'কে বলে গেলাম রোববার দিন ওকে নিয়ে বাসায় এসো। কাসেদ অবাক হয়ে বললো, রোববার দিন কেন?

মা বললেন, তোমাদের দাওয়াত করে গেলেন উনি। নাতিনের আকিকা হবে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না কাসেদ। যখন বুঝতে পারলো তখন আরো চিন্তিত হলো সে, সালমার মেয়ে হয়েছে নাকি?

মা পরক্ষণে বললেন, ওমা তুই জানিসনে? বলতে গিয়ে কথাটা গলার মধ্যে আটকে গেলো তার। ঢোক গিলে আবার বললেন, আজ তিন মাস হতে চললো, তা তুই জানবি কোত্থেকে, আত্মীয়-স্বজন কারো খোঁজ কি তুই রাখিস। কি যে হলি বাবা।

খালু হেসে বললেন, ও কিছু না বড়বু। এ হলো কেরানী রোগ।

নিজে তো এককালে করেছি, বুঝি। ফাইল, কলম, আর বড় সাহেব ছাড়া দুনিয়াতে আর কারো কথা মনে থাকে না, সব ভুলে যেতে হয়।

আরেকটা পান মুখে পুরে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিলেন খালু।

পাকঘরে বসে খাওয়ার আয়োজন করছে নাহার।

মা কলতলায় বসে বসে অজু করছেন। এশার নামাজ না পড়ে ভাত মুখে দেন না তিনি।

কাসেদ তখনো মায়ের বিছানায় বসে।

নীরব।

নীরবে ভাবছে সে।

কি আশ্চর্য, সালমা মা হয়েছে।

সেই সালমা–

পরনে কালো ডোরাকাটা ফ্রক। মাথায় সাপের মত সরু একজোড়া বিনুনী। পায়ে স্লিপার।

অপরিসর বারান্দায় রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে ওর চোখজোড়া দু'হাতে চেপে ধরলো কাসেদ।

এই কি হচ্ছে, হাতজোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সালমা। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সে সহসা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, সেই কখন থেকে বসে আছি আর উনি এতক্ষণে এলেন।

ওর একটা বিনুনীতে টান মেরে কাসেদ বললো, এই তোকে একশো বার নিষেধ করে দিয়েছি না মিথ্যে কথা বলিসনে।

সালমা অবাক হয়ে বললো, বা-রে মিথ্যে কথা কই বললাম।

এই তো বললি।

কই, কখন?

এইতো একটু আগে।

ইস, উনি বললেই হলো, ঠোঁট উল্টে মুখ ভেংচালো সালমা।

ওর বেণী জোড়া ধরে আবার টান দিলো কাসেদ, বসে আছি বললি কেন, তুই তো আসলে দাঁড়িয়েছিলি।

চুলে টান পড়ায় যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো সালমা। তারপর চিৎকার করে উঠে বললো, বলবো, একশোবার মিথ্যে কথা বলবো আমি। তাতে তোর কি শুনি।

কাসেদ ক্ষেপে গিয়ে ওর মাথাটা রেলিঙের সঙ্গে ঠুকে দিয়ে বললো, তুই করে বললি কেন রে, আমি কি তোর ছোট না বড়?

সালমা ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে।

ওকে কাঁদতে দেখে কাসেদ বিব্রতবোধ করলো। বার কয়েক হাফপ্যান্টে হাত মুছলো সে। তারপর কাছে এসে দাঁড়িয়ে কোমল গলায় বললো, লেগেছে না-রে?

সালমা কোনো জবাব দিলো না।

একটু পরে ওর পিঠের উপর ভয়ে ভয়ে একখানা হাত রেখে কাসেদ শুধালো, পার্কে যাবি না?

এক ঝটকায় ওর হাতখানা দূরে সরিয়ে দিলো সালমা।

কাসেদ আবার রেগে গিয়ে বললো, এই এক দুই করে আমি দশ পর্যন্ত গুনবো; এর মধ্যে যদি তুই না যাস তাহলে আমি চললাম। বলে জোরে জোরে এক দুই গুনতে শুরু করলো সে। ন'য়ে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো কাসেদ। সালমা তখনো কাঁদছে।

কাসেদকে চুপ করে থাকতে দেখে একবার শুধু আড়চোখে তাকালো সালমা।

কাসেদ অতি কষ্টে দশ উচ্চারণ করলো; কিন্তু সঙ্গে বললো; দেখ তোকে পনেরো পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিলাম। এবার কিন্তু একটুও নড়চড় হবে না। বলে আবার গুনতে শুরু করলো সে।

পনেরো বলার পূর্ব মুহূর্তে সালমা চিৎকার করে উঠলো, তুই আমাকে মেরেছিস কেন?

কাসেদ হেসে দিয়ে বললো, আর মারবো না, চল।

ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো সালমা। তারপর ফিক্ করে হেসে দিয়ে বললো, আজ কিন্তু আমাকে দোলনায় চড়াতে হবে।

আর একদিন।

তখন ফ্রক ছেড়ে সালওয়ার পায়জামা ধরেছে সালমা।

বয়স বেড়েছে। হয়তো পনেরো কিম্বা ষোল।

ঘুটঘুটে সন্ধ্যা। আকাশে অসংখ্য মেঘের ভিড়। এই বুঝি বৃষ্টি এলো। কাঠের সিঁড়িগুলো বেয়ে উপরে উঠে এসে কাসেদ দেখলো, বাসায় কেউ নেই। শুধু সালমা ড্রয়িং রুমে একখানা চৌকির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে কি একটা পত্রিকা পড়ছে।

কে কাসেদ ভাই, এই সন্ধ্যাবেলা কোত্থেকে?

মহাবিদ্যালয় মানে কলেজ থেকে, বাসায় কি কেউ নেই?

না, ওরা সবাই সিনেমায় গেছে।

তুমি যাওনি?

যাইনি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। পত্রিকাটা বন্ধ করে উঠে বসে সালমা বললো, শরীরটা সেই সকাল থেকে ভালো নেই।

কেন, কি হয়েছে? ওর সামনে চৌকিতে এসে বসলো কাসেদ।

সালমা বললো, অসুখ করেছে।

কি অসুখ?

সালমা ফিক্ করে হেসে দিলো এবার যান, অতো কথার জবাব দিতে পারবো না। একটা কিছু পেলেই হলো, অমনি সেটা নিয়ে প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কি বিশ্রী স্বভাব আপনার। কাসেদ গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বিশ্রী স্বভাব দিয়ে তোমায় আর ব্যতিব্যস্ত করবো না, চলি এবার।

মুহূর্তে ওর পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো সালমা। যাবেন কি করে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

হোক, তাতে তোমার কি?

সালমা মুখ টিপে হাসলো একটুখানি। তারপর বললো, ইস, এত রাগ নিয়ে আপনি চলেন কি করে।

সহসা ওর খোলা চুলের গোছা ধরে একটা জোরে টান মারলো কাসেদ। রাগে ফেটে পড়ে বললো, ফাজিল মেয়ে কোথাকার। ইয়ার্কির আর জায়গা পাও না, তাই না?

সালমার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো। দেখতে না দেখতে চোখজোড়া পানিতে টলমল করে উঠলো ওর। সামনে থেকে সরে গিয়ে নিঃশব্দে আবার কৌচের উপরে বসলো সে। পরক্ষণে ডুকরে কেঁদে উঠলো সালমা, আমি এমন কি করেছি যে, আপনি সব সময় আমার সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার করেন?

চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালো কাসেদ।

সালমা কাঁদছে।

কৌচের ওপর উপুড় হয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে সে।

খোলা জানালা দিয়ে আসা বাতাসে নয়, কান্নার আবেগে দেহটা কাঁপছে তার।

খোলা চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো।

ধীরে ধীরে ওর পাশে এসে বসলো কাসেদ।

সালমা, সে ডাকলো ভয়ে ভয়ে।

সালমা কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মাথার উপর আস্তে করে একখানা হাত রাখলো সে। সালমা। সহসা উঠে বসলো সালমা। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো এক পলক ওর দিকে। তারপর তীব্র বেগে ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

কাসেদ ডাকলো, সালমা।

সালমা সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

তারপর আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না তার।

সেদিন অনেকক্ষণ একা ঘরে বসেছিলো কাসেদ। ভেবেছিলো হয়তো এক সময় রাগ পড়ে গেলে বাইরে আসবে সালমা।

সালমা আসেনি।

অন্যদিন।

খালুজী তখন বরিশালে বদলী হয়ে গেছেন।

সালমা কলেজে পড়ে।

অফিসের কি একটা কাজে বরিশাল যেতে হলো তাকে।

তিন দিন ছিলো।

যেদিন রাতে সে চলে আসবে সেদিন সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়া হলো, কিন্তু সালমাকে আশেপাশে কোথাও খুঁজে পেল না।

খালাম্মাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, কি জানি কোথায় গেলো। বোধ হয় ছাদে, বলে বার কয়েক ওর নাম ধরে ডাকলেন তিনি।

কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না।

কিছুক্ষণ পরে ছাদে এসে কাসেদ দেখলো, সালমা দাঁড়িয়ে। ছাদের এক কোণে, চুপচাপ।

পরনের কালো শাড়িটা গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে তার। চুলগুলো এলো খোঁপা করা।

দূরে, স্টিমার ঘাটের দিকে তাকিয়ে কি যেন গুনগুন্ করছে সে।

হয়তো কোনো গানের কলি কিম্বা কোনো অপরিচিত সুর।

কাসেদ ডাকলো, সালমা।

সালমা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো ওর দিকে। কিছু বললো না।

কাসেদ বললো, আমি যাচ্ছি সালমা।

সালমা পরক্ষণে বললো, যাবেন বৈ-কি, আপনাকে তো কেউ ধরে রাখে নি।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, না, তা নয়, তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।

সালমা মৃদু গলায় বললো, বেশ বিদায় দিলাম।

কাসেদ চলে যাচ্ছিলো, সালমা পেছন থেকে ডাকলো তাকে, শুনুন, এখুনি কি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

এত সকাল সকাল গিয়ে কি হবে।

সকাল কোথায়, স্টিমারের সময় হয়ে গেছে।

কে বললো, এখনো দু'ঘণ্টা বাকি।

বাজে কথা।

চলুন, ঘড়ি দেখবেন।

কাসেদের সঙ্গে নিচে নেমে এলো সালমা।

ড্রয়ার থেকে খালুজীর ঘড়িটা বের করে এনে দেখালো তাকে। বললো, আমার কথা বিশ্বাস করেন নি তো, এই দেখুন, এখন মাত্র ন'টা বাজে। স্টিমার ছাড়বে এগারোটার সময়।

ঘড়ি দেখে অবাক হলো কাসেদ। সেই কখন সন্ধ্যা হয়েছে; এতক্ষণে ন'টা। সালমা কোনো জবাব দিল না। ঘড়িটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটা খুলে চুলে চিরুনি বুলোতে লাগলো সে। সহসা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে শুধালো, যাবার জন্যে অমন হন্যে হয়ে উঠছেন কেন শুনি।

কাসেদ বললো, চিরকাল থাকবো বলে আসিনি নিশ্চয়। কাজে এসেছিলাম, সারা হলো, চলে যাচ্ছি।

চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সালমা।

তারপর মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে মৃদু গলায় বললো, আপনাকে চিরকাল এখানে থাকতে বলছেই বা কে।

বললেও হয়তো আমি থাকতাম না।

নিজেকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো? হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে উঠলো সালমা।

কাসেদ শান্ত স্বরে বললো, একজন অধম কেরানী।

কেরানীর অত দেমাক কেন?

কবি বলে।

সালমা চুপ করে গেলো। চিরুনিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। চুলগুলো আবার খোঁপায় বাঁধলো। বন্ধ জানালাটা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলো সে। বাইরে আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ নেই। আছে শুধু অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকারে ঢাকা দূরের দিগন্ত।

জানালা থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে এলো সালমা। চুপ করে বসে আছেন কেন, আপনার স্টিমারের সময় হয়ে গেছে। একটু পরে গিয়ে দেখবেন, ওটা আর ঘাটে নেই।

তা নিয়ে তোমার আর মাথা ঘামাতে হবে না। কাসেদ আস্তে করে বললো, স্টিমার ছাড়ার এখনো অনেক দেরি।

সালমা ম্লান হাসলো। তারপর ড্রয়ার থেকে ঘড়িটা বের করে এনে মৃদু গলায় বললো, ওটা আমি এক ঘণ্টা স্লো করে দিয়েছিলাম।

কেন?

আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই। বলে সামনে থেকে সরে গেল সালমা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আর এলো না।

মা, নামাজ পড়া শেষ করে এসে ছেলের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

হাতের তালুতে মুখ রেখে ওপাশের দেয়ালের কি যেন দেখছে সে।

চোখের মণিজোড়া স্থির নিষ্পলক।

কি রে ভাত খাবি না?

মায়ের ডাকে চোখের পলক নড়ে উঠলো তার। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা বসে পড় আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।

একখানা মাদুরের ওপর পাশাপাশি দুটো থালা সাজানো। সামনে একটা বড় পেয়ালার মধ্যে তরকারি আর অন্য একটি থালায় বাড়তি ভাত ঢালা। নাহার এখন খাবে না।

ওদের দু'জনের খাওয়া হয়ে গেলে তারপর সে বসবে খেতে।

আজকে নয়। বহুদিন থেকে এই রীতি চলে আসছে তার।

যেদিন রাতে কাসেদের ফিরতে দেরি হয় সেদিন মা ঘুমিয়ে পড়লেও সে ঘুমোয় না। উঠে দরজাটা খুলে দেয়। সাবান, তোয়ালে আর পানির বদনাটা নিয়ে রেখে আসে কলতলায়। খাবারগুলো সাজিয়ে দেয় টেবিলের ওপর। তারপর যতক্ষণ কাসেদ খায় নাহার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, আর কিছু দেবো?

না।

সে চুপ।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে থালাবাসনগুলো নিয়ে কলতলায় চলে যায় সে।

কলতলায় পানি পড়ার শব্দ শোনা যায় অনেকক্ষণ ধরে।

আজ খেতে বসে মা শুধোলেন, কাল জাহানারা কেন এসেছিলো রে?

আবার জাহানারা!

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, এমনি।

মা বললেন, মেয়েটা বড় ভালো, লেখাপড়া শিখেছে তাই বলে নাক উঁচু নয়।

আস্তে আস্তে কথা বলে। চেহারাটাও বেশ মিষ্টি। ওর বাবা করে কিরে?

কাসেদ মুখ না তুলেই বললো, উকিল।

মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। নীরবে খাচ্ছেন তিনি। হয়তো কিছু ভাবছেন। এ মুহূর্তে তাঁর মনে কিসের ভাবনা রয়েছে তা ঠিক বলে দিতে পারে কাসেদ। ভাবছেন জাহানারার মত একটি মেয়েকে যদি বউ সাজিয়ে ঘরে আনা যেতো।

অফিসে থাকাকালীন সময়টা মন্দ কাটে না কাসেদের।

কাজের চাপে তখন বাইরের দুনিয়ার কথা মনে থাকে না। এটা হলো ফাইল, টাইপ রাইটার, চিঠিপত্র আর কাগজ কলমের পৃথিবী। এখানে জাহানারা, শিউলি, সালমা, সেতার কিম্বা কবিতার প্রবেশ নিষেধ।

এখানকার প্রথম কথা হলো কাজ।

দ্বিতীয় কথা হলো তোয়াজ।

তৃতীয় কথা হলো ফাঁকি।

এ তিনের অপূর্ব মিশ্রণে অফিসের সময়টুকু বেশ কাটে ওর।

কর্মচারীর সংখ্যা নেহায়েৎ নগণ্য নয়।

বড় সাহেব আছেন একজন। সবার বড়। বয়স তাঁর ত্রিশের কোঠায়। সুন্দরী বউ আছে বাড়িতে আর একটি ফুটফুটে ছেলে। বড় সাহেব ভীষণ পরিশ্রমী। কাজ করে কখনো ক্লান্ত হন না তিনি। কাউকে অলসভাবে বসে থাকেত দেখলে ধমকে উঠেন, বলেন, এই জন্যে আমাদের জীবনে কিছু হলো না, হবেও না। এই যে দেখছেন অফিসের বড় কর্তা হয়ে বসেছি, গাড়ি, বাড়ি করেছি, এগুলি নিশ্চয় খোদা আকাশ থেকে ফেলে দেননি, এর জন্যে অসুরের মত খাটতে হয়েছে আমায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে না বলে থেমে যান সাহেব। পরিমিত হাসেন। সে হাসির অর্থ ধরে বাকি কথাটা বুঝে নিতে হয়।

বড় সাহেবের পরে যার স্থান তিনি পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ। সামনের কয়েকটা দাঁত ঝরে গেছে বহু আগে। যত কাজ করেন তার দিগুণ পান খান, আর তার চেয়েও অনেক বেশি কথা বলেন। কথা না বললে নাকি তার কাজের মুড্ আসে না। গৃহী মানুষ। এই বৃদ্ধ বয়সেও বিরাট পরিবারের ভার বহন করে চলেছেন। ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নেহায়েৎ নগণ্য নয়, তার ওপর নাতিনাতনী আছে অনেক।

বুড়ো মকবুল সাহেবের পাশে যার আসন তিনি টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত। একাউন্‌টেন্ট নওশের আলী এখনো বিয়ে করেন নি। করবেন বলে ভাবছেন। রোজ ভাবেন। কিন্তু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবও মিলছে না আর তাঁর বিয়ে করাও হয়ে উঠছে না। এরপর, কাসেদকে বাদ দিলে আরো চারটে প্রাণী আছে অফিসে। প্রথম দু'জন কেরানী, কাসেদের সমগোত্রীয়। এক গোয়ালের গরু নাকি এক সঙ্গে ঘাস খায় না। এক গোত্রীয় মানুষগুলোর পক্ষেও একতালে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই, তিন কেরানীর মধ্যে কথাবার্তা খুব কম হয়। মেলামেশা তার চেয়েও কম।

একটি দারোয়ান। খোদাবক্স তার নাম। পশ্চিমে বাড়ি ছিল তার, বিহার কিম্বা উড়িষ্যায়। দেশ বিভাগের পর পূর্ব দেশে হিজরত করেছে। সঙ্গে এসেছে দু'টি বউ আর একটা রামপুরী ছাগল। অফিসের পাশেই ওরা থাকে। সারাদিন কলহ করে ডাল-রুটি আর স্বামী সোহাগ নিয়ে। খোদা বক্স নির্লিপ্ত পুরুষ। নীরবে বসে বসে গোঁফের ডগা জোড়া মসৃণ করে আর খইনি খায়।

আজ অফিসে ঢুকবার পথে খোদাবক্স টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সালাম ঠুকলো তাকে। কাসেদ বুঝতে পারলো ও কিছু বলতে চায়। কেমন আছো খোদাবক্স, কিছু বলবে?

খোদাবক্স বিনয়ের সঙ্গে শুধালো, মেরা দরখাস্ত কা কুচ হুয়া সাহেব?

কিছুদিন আগে বেতন বাড়াবার জন্যে বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলো সে। দু'টি বউ আর এক ছাগলের সংসার পঞ্চাশ টাকায় চলে না তাই লিখে জানিয়েছিলো।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, হবে হবে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো খোদা বক্স।

বড় সাহেব নিশ্চয় এবার তোমার বেতন বাড়িয়ে দেবেন। খোদা বক্স খুশি হয়ে আর একটা সালাম ঠুকলো। বললো, আপকা মেহেরবানী হুজুর।

কাসেদ ওকে শুধরে দিলে বললো, আমায় নয়, বড় সাহেবেরে বলো। বলে ভেতরে চলে এলো সে।

বড় সাহেব ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। রুমে বসে দু'নম্বর কেরানীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

নওশের আলী ফাইলে মুখ ঢুকিয়ে হিসেব নিয়ে ব্যস্ত।

মকবুল সাহেব মুখের মধ্যে একজোড়া পান গুঁজে দিয়ে বললেন, এই যে, তিন নম্বর কেরানী আপনি তিন মিনিট লেট করে এসেছেন, ঘড়ি দেখুন।

কারো ওপর রাগ করলে তার নাম নিতে ভুলে যান তিনি, মনগড়া কতগুলো নম্বর ধরে সম্বোধন করেন। এতে রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও কেউ কিছু মনে করে না, বলে–লোকটার মাথায় ছিট আছে। কাসেদ ঘড়ি দেখলো সত্যি সে তিন মিনিট লেট।

কিছু না বলে চুপচাপ তার চেয়ারটায় গিয়ে বসলো কাসেদ। ফাইলগুলো টেনে নিলো সামনে। ওপরের ফাইলটার এককোণে টানা হাতে লেখা একটা নাম–'জাহানারা'।

কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো লিখে রেখেছিলো সে।

কলমটা তুলে নিয়ে সাবধানে নামটা কালি দিয়ে ঢেকে দিলো সে।

চারপাশে তাকালো এক পলক।

মকবুল সাহেব এখনো তার তিন মিনিট লেট হওয়া নিয়ে চাপা স্বরে রাগ প্রকাশ করছেন। হঠাৎ ছাতার কথা মনে পড়ে গেল কাসেদের। নিজের টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বললো, মকবুল সাহেব, আমার ছাতাটা?

প্রথমে ওর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন মকবুল সাহেব, সহসা লজ্জা পেয়ে বললেন, এই দেখুন আপনার ছাতাটা আনতে গিয়ে রোজ ভুলে যাই। আপনি এক অদ্ভুত লোক তো সাহেব, অফিস থেকে যাবার সময় আমায় একটু মনে করিয়ে দিলে পারেন।

কাসেদ আস্তে করে বললো, কি করব বলুন, আমিও ভুলে যাই।

মকবুল সাহেব তাঁর পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসলেন। বললেন, বেশ লোক তো আপনি, বলে একটুখানি থামলেন তিনি, থেমে বললেন, আজ বিকেলে মনে করিয়ে দেবেন ; কাল নিশ্চয় নিয়ে আসবো।

ফাইলগুলো খুলে কাজে মন দিলো কাসেদ। অনেকগুলো চিঠি টাইপ করতে হবে আজ।

তারপর বড় সাহেবের স্বাক্ষর নিয়ে সেগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন কোম্পানীর অফিসে। পিয়ন-বইতে নাম, ঠিকানা সব তুলে রাখতে হবে।

কাসেদ সাহেব।

জী।

এক কাজ করুন না, আজ অফিস ছুটি হলে আমার সঙ্গে চলে আসুন বাসায়। ছাতাটা নিয়ে যাবেন। গোল কৌটোটা খুলে আর একটা পান বের করলেন মকবুল সাহেব।

কাসেদ আস্তে করে বললো, আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে।

আজ নতুন নয়। এর আগেও অনেকবার তাকে বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মকবুল সাহেব। আজ যাবো কাল যাবো করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। লোকে বলে, বাসায় নেমন্তন্ন করার পেছনে নাকি কন্যাদায় মুক্ত হওয়ার একটা গোপন আকুতি রয়েছে।

কথাটা সত্য কি মিথ্যে কাসেদ জানে না।

শুধু এই জানে, বিবাহযোগ্য তিনটি মেয়ে রয়েছে তাঁর। তাদের বিয়ে দিতে হবে। বিত্তশালী পাত্রের কল্পনা নেই, চলনসই হলেই হলো। ওদের কথা মাঝে মাঝে আলোচনা করেন মকবুল সাহেব। তখন তাকিয়ে দেখলে হঠাৎ করে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স আরো বেড়ে গেছে।

চোয়ালের হাড়জোড়া আরো উঁচু। দু'চোখ আরো কোটরাগত। বৃদ্ধ কেরানী সহসা মুমূর্ষু রোগীর মত হয়ে যায়।

একবার এই অফিসের একটি ছেলেকে নাকি জামাতা বানাবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন তিনি।

বড় মেয়েটির সঙ্গে বিশেষ ভাবও জন্মে গিয়েছিলো ছেলেটির।

কিন্তু বিয়ে হলো না।

ছেলেটি রাজী হলো না বিয়ে করতে।

কেন?

কেউ জানে না।

শুধু জানে, ছেলেটি নাকি মকবুল সাহেবের কাছ থেকে কিছু নগদ কড়ি দাবি করেছিলো।

মকবুল সাহেব রাজী হন নি বরং ক্ষেপে গিয়ে বড় সাহেবকে ধরে কনিষ্ঠ কেরানীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

তারই জায়গায় পরে কাসেদকে নেয়া হয়েছে।

মেশিনটা টেনে নিয়ে দ্রুত টাইপ করে চলল কাসেদ। অফিসে এখন সবাই চুপ।

টাইট-রাইটারের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বড় সাহেব বার কয়েক টহল দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকের টেবিলে এসে নীরবে দেখে গেছেন, কে কি করছে।

এখন তিনি ফিরে গেছেন তাঁর চেম্বারে।

কপারে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে ঘামগুলো মুছলো কাসেদ।

স্যার।

কিরে?

সাহেব ডেকেছেন আপনাকে?

মুখ তুলে বেয়ারাটার দিকে তাকালো কাসেদ।

সজাগ সাহেব বুঝি কিছু লক্ষ্য করে গেছেন কে জানে। সবার সামনে তিনি কাউকে কিছু বলেন না। নিজের চেম্বারে ডেকে বলেন। হয়তো মানুষের আত্মসম্মান বোধের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, তাই।

মানুষ মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভাবে। কখনো তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো যায় না। তবু তার ভাবনার শেষ হয় না।

দু'নম্বর কেরানীর টেবিল থেকে বড় সাহেবের চেম্বারে আসতে হলে মাত্র উনিশটি পদক্ষেপের প্রয়োজন। কিন্তু, এর মধ্যে আকাশ-পাতাল কত কিছুই না চিন্তা করেছে কাসেদ। চাকরীর প্রমোশন থেকে বরখাস্ত কোন কিছুই বাদ যায় নি।

বড় সাহেব এইমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

সামনে রাখা একটা গোটা বইয়ের উপর নীরবে চোখ বুলোচ্ছেন তিনি।

মুখ না তুলেই আস্তে করে বললেন, আপনার ফোন।

টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা রিসিভারটার দিকে তাকালো কাসেদ।

সহসা বুঝতে পারল না এ সময় কে ফোন করতে পারে তাকে।

হ্যালো।

হ্যালো– অন্য প্রান্ত থেকে মিহি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

বিব্রত কাসেদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। আড়চোখে একবার এক পলক তাকালো বড় সাহেবের দিকে। তিনি নির্লিপ্ত।

হ্যালো, আপনি কে বলছেন? সাহস সঞ্চয় করে মহিলার নাম জানতে চাইলো সে।

অন্য পক্ষের হাসির শব্দ শোনা গেলো। আমাকে চিনতে পারছেন না বুঝি?

না, না-তো।

একটু চিন্তা করুন, ঠিক চিনতে পারবেন।

রিসিভারটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ।

চিন্তা করলো, কিন্তু চিন্তা করে সময় সময় সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না।

পেলেও সকল ক্ষেত্রে তা সত্য হয় না।

হ্যালো, অন্য পক্ষ আবার ডাকলো।

কাসেদ এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে চান?

আপনাকে। মহিলা আবার হেসে উঠলেন।

আপনাকে? বলতে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিললো কাসেদ। কিন্তু কেন বলুন তো?

একটা কবিতা শোনাবার জন্য। শোনাবেন কি?

রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে কাসেদ। এ কার পাল্লায় পড়লো সে?

কিন্তু পরক্ষণে ওর মনে হলো, জাহানারা নয়তো?

হ্যালো, হ্যালো।

না, জাহানারার গলার স্বরটা কোন মতেই এত মিহি নয়। দু'একবার ফোনে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো কাসেদের। কখনো এমন তো মনে হয় নি।

হ্যালো, চুপ রইলেন যে?

চুপ না থেকে কি করবো বলুন।

বললাম তো একটা কবিতা আবৃত্তি করুন।

কাসেদ আরেক বার তাকালো বড় সাহেবের দিকে। মনে হলো তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ, কাজের সময় কোন মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করাটা তাঁর কাছে ভাল ঠেকছে না।

হ্যালো।

হ্যালো।

বলুন।

আমি শিউলি বলছি।

শিউলি। যার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো জাহানারাদের বাসায়, জন্মদিনের আসর থেকে এক সঙ্গে বাসায় ফিরেছিলো ওরা।

আপনি কোত্থেকে বলছেন?

কলেজ থেকে।

ক্লাস নেই বুঝি।

না।

তাহলে বসে বসে একটা কবিতার বই পড়লেই পারেন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো কাসেদ।

বড় সাহেব এতক্ষণে মুখ তুলে এক পলক তাকালেন ওর দিকে। তাঁর চোখে বিরক্তি নেই। আছে কৌতূহল। যেন আলাপটা নীরবে উপভোগ করছিলেন তিনি। কান পেতে শুনছিলেন সব।

ফোনের ওপর হাত রেখে তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে কাসেদ। শিউলির সঙ্গে অমন অভদ্র ব্যবহার না করলেও পারতো সে। কে জানে কি ভাবছে। জাহানারার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সব কিছু খুলে বলবে সে। বলবে, তোমার কেরানী বন্ধুটিকে ভদ্রতা শিখতে বলো।

জাহানারা কি মনে করবে কে জানে। হয়তো খুশি হবে। বলবে কাসেদকে তুমি চেনো না শিউলি, তাই অতবড় অপবাদ দিতে পারলে।

ওর মত মানুষ হয় না।

কিম্বা জাহানারা রেগে যাবে। ভ্রূজোড়া বাঁকিয়ে বলবে, কেরানী তো, ভদ্রতা শিখবে কোত্থেকে।

না, জাহানারা অমন কথা বলতে পারে না। সে তার মনের মানুষ। তার মুখ দিয়ে অমন একটা রূঢ় মন্তব্য কল্পনা করতেও পারে না কাসেদ। কিন্তু ওর জন্যে একটা সেতারের মাস্টার এখনো ঠিক করা গেলো না। আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে যে কোন একজন ভালো সেতারীর সঙ্গে আলাপ করা। লোকটার কার্তিকের মত চেহারা হলে চলবে না, তাকে বুড়ো হতে হবে কিম্বা কুৎসিত। জাহানারা হাসবে, হেসে লুটিয়ে পড়বে বিছানায়। মুখখানা বিকৃত করে বলবে, লোকটা দেখতে কেমন বিচ্ছিরি, তাই না? তোমার মত সুপুরুষ আর একটিও দেখলাম না জীবনে। এত রূপ তুমি কোথায় পেলে বল না গো।

দুলিচাঁদের কাছে লেখা চিঠিটা কি টাইপ করা হয়ে গেছে? জাহানারা নয়– বড় সাহেব।

হ্যাঁ, স্যার। ওটা তৈরি আছে, নিয়ে আসবো কি?

আমার প্রয়োজন নেই, পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্তু করুন, আর শুনুন, আজ অফিস শেষে চট করে চলে যাবেন না। অনেক কাজ পড়ে আছে, সেগুলো শেষ করতে হবে, আমিও থাকবো এখানে। বলে, ক্ষয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছাইদানীতে রেখে দিলেন বড় সাহেব। সামনে খুলে রাখা বইটির প্রতি আবার মনোযোগ দিলেন তিনি।

কাজ বিশেষ কিছু নেই তা জানতো কাসেদ।

এমনি হয়। অতীতেও হয়েছে।

অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরেও নিজের চেম্বারে চুপচাপ বসে থাকে বড় সাহেব। কখনো বই পড়েন। কখনো চিঠিপত্র লেখেন বসে বসে। সব সময় একা একা ভালো লাগে না বলে মাঝে মাঝে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে কোন একজনকে রেখে দেন সঙ্গে। কথা বলেন, এটা, সেটা কাজ করান। গল্প করেন, নিজের জীবনের গল্প। বাবা বড় গরিব ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। বেতন পেতেন মাসে পনেরো টাকা। তাও নিয়মিত নয়। ছোটবেলা কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে তাঁকে।

দূর গাঁয়ে জায়গীর থাকতেন বড় সাহেব। তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতেন। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যেতো। তখন দু'পায়ে ব্যথা করতো ভীষণ।

পরের বাড়িতে ঠিকমত খাওয়া জুটতো না। বই কেনার পয়সাও ছিলো না তাঁর। সহপাঠিদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পড়তেন। রাত জেগে পড়বার উপায় ছিলো না। ওতে তেল খরচ হয়। তেল কেনার টাকা কোথায়?

তবু কোনদিন দমে যাননি বড় সাহেব। হতাশা আসতো মাঝে মাঝে, তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেন তিনি। কান্না পেতো, কাঁদতেন, চোখের পানি ধীরে ধীরে চোখেই শুকিয়ে যেতো।

কিন্তু কান্নারও শেষ আছে বুঝলেন? সামনে ঝুঁকে পড়ে বড় সাহেব বললেন, জীবনে এত কষ্ট করেছি বলেই তো সুখের মুখ দেখতে পেয়েছি। এখন আমার মতো সুখে ক'টি লোক আছে বলুন?

বড় সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কাসেদের মনে হলো, সত্যি কি লোকটা সুখে আছে?

অফিসের লোকজন বলে, সুখে যদি থাকবে তাহলে এই কাঁচা বয়সে চুলে পাক ধরেছে কেন বলতে পারো।

এক নম্বর কেরানী বলে, চিন্তায় পেকেছে। মানুষ যত বড় হয়, ওদের চিন্তা তত বড়।

একাউন্টেন্ট বলেন, চিন্তা নয় দুশ্চিন্তা। তা হবে না কেন, ঘরের বউ যদি পরপুরুষের সঙ্গে হল্লা করে বেড়ায় তাহলে কার মন-মেজাজ ঠিক থাকে বলো।

বড় সাহেবের গিন্নীকে অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলো কাসেদ। সারা মুখে কৃত্রিমতা মেখে অফিসে এসেছিলেন তিনি, স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। দৈহিক লাবণ্যের প্রদর্শনী দেখিয়ে মহিলা সেই যে গেলেন আর আসেননি কোনদিন।

দারওয়ানকে দিয়ে চা-নাশতা আনলেন বড় সাহেব।

ইতিমধ্যে দু'-একখানা ফাইলও নাড়াচাড়া হলো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সহসা বড় সাহেব শুধোলেন, ঢাকায় ফুচকা পাওয়া যায়?

কাসেদ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, যায় বই কি।

আপনি ফুচকা খান?

না।

খেয়েছেন কোনদিন?

না।

আমি খেয়েছি। অনেক খেতাম ছোটবেলায়। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে বড় ভালো লাগতো।

বড় সাহেব চুপ করে গেলেন। আজকের বিত্তবান দিনগুলোর চেয়ে হয়তো ছেলেবেলাকার অনটনে ভরা, ফুচকা-খাওয়া দিনগুলোকে আজও অনেক প্রিয় বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

আশ্চর্য মানুষের মন। সে যে কখন কি চায় তা নিজেও বলতে পারে না। কিসে তার সুখ আর কিসে তার অসুখ এর সত্যিকার জবাব সে নিজেও দিতে পারে না কোনদিন।

জাহানারা, যদি কোনদিন সময় মেলে, তোমার মনের অর্গল তুমি খুলে দিয়ো আমার কাছে। তোমার অনেক চাওয়ার পাশে আমার অনেক পাওয়ার স্বপ্নগুলোকে থরেথরে সাজিয়ে নেবো। গরমিল চাইনে জীবনে, দেখছো না, মিলের অভাবে মানুষগুলো কেমন মরোমরো হয়ে আছে।.এ তোমার ভুল ধারণা কাসেদ। জাহানারা আস্তে করে বললো, অভাবটা মিলের নয়, রঙের। আমাদের জীবনে রঙ নেই।

রঙ। রঙ সে আবার কি?

ওর প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলো জাহানারা। মুখখানা ঈষৎ হেলিয়ে বললো, এর কোনো আকার নেই। থাকলে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম। আসলে ওটা একটা অনুভূতি যা মানুষের চেহারায় আনে উজ্জ্বলতা, মনে যোগায় আনন্দ, দেহকে দেয় উষ্ণতা আর প্রাণকে করে সজীব।

জাহানারার দু'চোখে তখন স্বপ্ন।

কি এক তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে।

চলুন, এবার ওঠা যাক। বড় সাহেব আস্তে করে বললেন।

কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

হয়তো সে অনেক বদলে গেছে।

এখন দেখলে আর সেই পুরনো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে উঠে যাবার পথে ভাবলো কাসেদ।

বারান্দার এককোণে একটা মোড়ার উপর বসেছিলো সালমা। চুলগুলো পিঠের ওপরে ফেলে দিয়েছে সে। পরনে একখানা কালো পাড়ের মিহি শাড়ি সাদা জমিনের ওপর হলুদ সুতোর ফুল আঁকা। কানে, গলায়, হাতে অলঙ্কারের বোঝা। সালমা চোখ তুলে কিছুক্ষণ এক পলকে তাকিয়ে রইলো। সহসা কিছু বলতে পারলো না সে, ওর ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে এক টুকরো মিষ্টি হাসি জেগে উঠলো। পরক্ষণে সারা মুখে সে হাসি ছড়িয়ে পড়লো, কাসেদ ভাই।

কাসেদ বললো, তোমাকে দেখতে এলাম সালমা।

সালমার মুখখানা অকারণে রাঙা হলো। উঠে দাঁড়িয়ে মোড়াটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে, বসো।

কাসেদ বসলো।

বাড়িতে আজ অনেক অতিথি এসেছে। ঘরে, বারান্দায় ছাদে ছড়িয়ে আছে ওরা। কথা বলছে, হাসছে, আলাপ করছে এটা-সেটা নিয়ে।

ব্যাপার কি, অনেক শুকিয়ে গেছ যে।

সালমার কথার জবাবে কাসেদ কি বললো স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

সালমা আবার শুধালো, প্রেমে পড়নি তো?

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, তার মানে?

মাথার চুলগুলো দু'হাতে খোঁপাবদ্ধ করতে করতে সালমা বললো, শুনেছি প্রেমে পড়লে নাকি লোক শুকিয়ে যায়।

ওসব বাজে কথা। প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য হয়তো, কাসেদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমার মেয়ে হয়েছে জানাওনি তো, একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে।

সালমা বললো, জানাতাম, কয়েকবার ইচ্ছেও হয়েছিল লিখি, কিন্তু কি জানো, আজকাল বড় আলসে হয়ে গেছি। একখানি চিঠি লিখবো তাও লিখি লিখি করে হয়ে ওঠে না।

কাসেদ বললো, কুড়িতেই বুড়ি হয়ে গেলে মনে হচ্ছে।

সালমা বললো, বুড়ি হয়নি তো কি, ক'বছর পরে মেয়ে বিয়ে দেবো।

বলতে গিয়ে নিজেই হেসে দিলো সালমা, তুমি বস, আমি পলিকে নিয়ে আসি।

আলসে মেয়েটি চপল ভঙ্গি করে ঘরে চলে গেলো, একটু পরে আবার যখন সে সামনে এসে দাঁড়ালো তখন তার কোলে একটা ফুটফুটে মেয়ে।

সালমা বললো, দেখতে ঠিক ওর বাবার মত হয়েছে।

কাসেদ বললো, গায়ের রঙটাও।

সালমা বললো, চোখজোড়া কিন্তু আমার।

হবেও-বা। কাসেদ মৃদু গলায় বললো, নাম কি রেখেছো?

সালমা জবাব দিলো, পলি। ওর বাবার দেয়া নাম। তোমার নিশ্চয় পছন্দ হয় নি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকা করে সালমা অপূর্ব কণ্ঠে শুধালো, তুমি হলে কি নাম রাখতে?

এসব বাতুল প্রশ্নের কোন মানে হয় না। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

সালমা বললো, তবু বল না শুনি।

কাসেদ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, তারপর বললো, কি নাম রাখতাম জানি না, তবে এ মুহূর্তে একটা নাম মনে পড়ছে আমার, বিপাশা, হয়তো তাই রাখতাম।

বিপাশা। বারকয়েক নামটা উচ্চারণ করলো সালমা। কি যে ভাবলো, ভেবে পরক্ষণে বললো, আমি ওকে বিপাশা নামেই ডাকবো।

এতে আমার আপত্তি আছে; ওর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাসেদ বললো, ওর বাবা যে নাম দিয়েছে সেই নামে তোমাকেও ডাকতে হবে। কাসেদের কণ্ঠে যেন ধমকের সুর। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো কাসেদ। পরিচিত একজন মহিলাকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলো।

কাসেদের মনে হল যেন এর আগে কোথাও দেখেছে তাকে। মহিলার চাউনি দেখে মনে হলো, তিনিও যেন তাকে চিনতে পেরেছেন। সালমা বললো, ইনি মিসেস চৌধুরী। ওর স্বামী বিপাশার বাবার সঙ্গে এক সাথে কাজ করতো কুড়িগ্রামে। আর ইনি হলেন-

ওকে আমি চিনি। সালমাকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস চৌধুরী অর্থপূর্ণ হাসি ছড়ালেন।

কাসেদ তখন স্মৃতির খাতায় মহিলার ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সহসা শুধালো, আপনাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি?

জী হ্যাঁ। মহিলা মৃদু হেসে বললেন, জাহানারাদের ওখানে।

বেশি ভাবতে হলো না মিসেস চৌধুরীর জন্যে। জাহানারাদের বাসায় আলাপ হওয়া মিলি চৌধুরীকে একটু পরেই খুঁজে পাওয়া গেলো।

মিলি চৌধুরী একটু শুধোলেন, ভালো আছেন তো?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, ভালো।

হঠাৎ কেন যেন সালমাকে গম্ভীর দেখালো। কাসেদের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে সে।

মিলি বললেন, নতুন কিছু লিখলেন?

কাসেদ বললো, না।

আলাপ জমলো না। একটু পরে বারান্দা ছেড়ে ঘরে চলে গেলেন মিলি চৌধুরী। এখানে দু'জন নীরব।

নীরবতা গুঁড়িয়ে কাসেদ শুধালো, হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

না, এমনি। সালমা সহজ হতে চেষ্টা করলো, পলির চোখেমুখে আদর করলো সে। দু'হাতে দোলনার মত করে বার কয়েক দোলাল তাকে।

তারপর যতদূর সম্ভব সহজ গলায় শুধালো, জাহানারাটা কে?

জাহানারা? সহসা কিছু বলতে পারলো না কাসেদ। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো তার। একটু পরে বললো, জাহানারা আমার একজন বান্ধবীর নাম।

বান্ধবী না আর কিছু? কাসেদের চোখেমুখে কি যেন খুঁজছে সালমা।

ওর চোখের মণিজোড়া সহসা বড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। সে হাসির কোন অর্থ আছে হয়তো, কিম্বা নেই।

কাসেদ শুধালো, বান্ধবীর অন্য কোন মানে আছে নাকি?

সালমা বললো, আগে ছিলো না। এখন আছে। আগের দিনে ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব হতো। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ের। আজকাল ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্বের পালাটা বড় জোড়েশোরে শুরু হয়েছে।

তাতে কি এর অর্থগত রূপটা পাল্টেছে?

পাল্টেছে বই কি? সালমা দৃঢ় গলায় বললো, এখন তার অর্থ এক নয়, অনেক। বন্ধুর স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী, নিজের স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী। বন্ধুর প্রেমিকা, তাকেও ডাকি বান্ধবী বলে, আবার নিজের প্রেয়সী তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, বান্ধবী। সব বান্ধবী এক হলো নাকি?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সালমা।

কাসেদ নীরব।

ওকে চুপ থাকতে দেখে সালমা আবার শুধালো, তোমার বান্ধবীটি কোন্ শ্রেণীর জানতে পারি কি? বলতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে এলো সালমা। কয়েকগুচ্ছ চুল মাথার উপর থেকে গড়িয়ে এসে কপালে ঢলে পড়লো, চুলগুলো এখন বাতাসে দুলছে।

কাসেদ তখনো নীরব।

খানিকক্ষণ পরে নীরবতা ভেঙে সে বললো, তুমি যে কয়েকটি শ্রেণীর কথা বললে তার কোনটিতেই সে পড়ে না।

সামান্য জবাবটা দিতে এত দেরি হলো কেন? ভ্রূজোড়া বিস্তৃত করে আবার শুধালো সালমা।

সহসা রেগে উঠলো কাসেদ। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করতে আমি আসিনি সালমা।

এসব আমার ভাল লাগে না। বলে উঠে দাঁড়ালো সে।

সে আমি জানি।। ম্লান গলায় আস্তে করে বললো সালমা। বলে মুখখানা কেন যেন অন্যদিকে সরিয়ে নিলো, সে হয়তো আড়াল করে নিলো কাসেদের কাছ থেকে। কাসেদ শুধু একবার ফিরে তাকাল, কিছু বললো না।

ঘরের ভেতর যেখানে ফরাস পেতে বুড়ো-বুড়িরা গল্পে মেতে উঠেছে সেখানে যাবার জন্যে পা বাড়ালো কাসেদ।

বুড়ো-বুড়িদের আলোচনার ধারা ভিন্ন রকমের।

এখানকার আলাপের প্রসঙ্গ অতি জাগতিক।

সোনা রুপোর দর কমলো কি বাড়লো।

কোন্ বাজারে ভালো তরি-তরকারি পাওয়া যায়।

কোন্ দোকানে সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি হয়।

কোথায় গেলে মেয়ের জন্য একটা ভালো পাত্র জোটার সম্ভাবনা আছে- এমনি সব আলোচনা।

কাসেদকে আসতে দেখে খালু বললেন, এসো বাবা, বোসো।

মা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে।

খালা পান চিবোচ্ছিলেন বসে বসে। আঙ্গুলের ডগা থেকে একটুখানি চুন চুষে নিয়ে বললেন, তুমি এলে ভালই হলো, শোনো বাবা, তোমার খালুজী নাহারের জন্য একটা ভালো প্রস্তাব এনেছেন।

মা বললেন, ওকে খুলে বলো না সব। ওই তো এখন বিয়ে দেবার মালিক। খালু বললেন, শোনো বাবা, ছেলে তেমন কেউকেটা একটা কিছু নয়। আই-কম পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষা দিয়েছিলো, পাশ করেনি। এখন ইডেন বিল্ডিং-এ চাকরি করে। সোয়া শ' টাকা বেতন।

কাসেদ আবার জিজ্ঞেস করলো, পরীক্ষাটা আবার দেয়নি ক্যান?

দেয়নি নয়, দেবে, আবার দেবে। খালু জবাব দিলেন, ছেলে ভালো এতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘরের কোণে পানের পিক ফেলে এসে বললেন, এক মায়ের এক ছেলে, বাবা মারা গেছে ছেলেবেলায়। একা ঘর।

মা বললেন, কোন ঝামেলা নেই, নাহার সুখেই থাকবে।

কাসেদ কোন মন্তব্য করলো না।

কথার ফাঁকে সালমা এসে বসেছে একপাশে। একটু গম্ভীর। একটু যেন অন্যমনস্ক।

খালু বললেন, আজকাল মেয়ে বিয়ে দেবার মত ঝকমারী আর নেই বড়বু। যাদের টাকা আছে তারা টাকা-পয়সা নিয়ে ভালো ভালো ছেলে বেছে নেয়।

খালা বললেন, শুধু মেয়ে কেন, ছেলে বিয়ে দিতেও কি কম ঝামেলা! একটা ভালো মেয়ে পাওয়া যায় না, আমাদের নজরুলের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, যা-ও পাওয়া গেলো, ও খোদা মেয়ের বাবা সি. এস. পি., সি. এস. পি. করে পাগল। সি. এস. পি. ছাড়া মেয়ে বিয়ে দিবেন না।

মা বললেন, আগের দিনে লোকে বংশ দেখতো। এখন সি. এস. পি. ছাড়া দেখে না।

খালু বললেন, ও কিছু না বড়বু, যুগের হাওয়া। যেমন আদি যুগ, মধ্যযুগ, আর কলিযুগ আছে, তেমনি বিয়ের ব্যাপারেও কতগুলো যুগ রয়েছে। ডাক্তার যুগ, ইঞ্জিনিয়ার যুগ, সি. এস. পি. যুগ। এখন সি. এস. পি. যুগ চলছে। বলে শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। অন্যমনস্ক সালমাও না হেসে পারলো না।

হাসলো সবাই।

খাওয়ার ডাক পড়ায় বৈবাহিক আলোচনা আর এগুলো না। আসর ছেড়ে সকলে উঠে পড়ল।

সালমা সামনে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, খাওয়ার টেবিলে তোমার পাশের চেয়ারটিতে আমি ছাড়া আর কাউকে বসতে দিয়ো না যেন, তুমি যাও, আমি বিপাশাকে বিছানায় রেখে আসি।

কাসেদ কিছু বলার আগেই সামনে থেকে সরে গেলো সালমা। সে শুধু বোকার মত তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

দিন কয়েক পরে অফিসে এসে শিউলির কাছ থেকে আরেকখানা টেলিফোন পেলো কাসেদ।

শিউলি বললো, আহ গলাটা চিনতে পারছেন তো?

কাসেদ জবাব দিলো, অবশ্যই পারছি।

শিউলি বললো, তাহলে শুনুন, আপনাকে কয়েকটা খবর দেবার আছে।

বাবা কুমিল্লায় বদলী হয়ে গেলেন।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখন বাসা ছাড়া পাখি।

তার মানে?

মানে এখন হোস্টেলে আছি।

হোস্টেলে?

জ্বী।

ওটা কি মুক্ত বিচরণ ভূমি নাকি?

কেন বলুন তো?

নিজেকে এইমাত্র বাসা ছাড়া পাখির সঙ্গে তুলনা করলেন কিনা, তাই।

ওই যা, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আপনি কবি মানুষ। টেলিফোনে মিহি হাসির শব্দ শোনা গেলো ওর। শিউলি হাসছে।

কাসেদ শুধালো, আপনার খবর বলা শেষ হলো?

শিউলি বললো, না আছে। হ্যালো, শুনুন, প্রত্যেক শুক্রবার আর রোববার আমাদের বাইরে বেরুতে দে'য়া হয়।

ভালো কথা, তারপর?

সামনের শুক্রবার আপনার কোন কাজ আছে কি?

আছে কি-না এখনো বলতে পারি নে।

না থাকলে আসুন না বিকেলের দিকে একটু বেড়ানো যাক।

কাসেদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, হঠাৎ বেড়াবার সাথী হিসেবে

শিউলি পরক্ষণে জবাব দিলো, আপনাকে ভাল লাগে বলে। সেই পরিচিত শব্দে হেসে উঠলো সে।

কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। রিসিভারটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে সরিয়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, এবার রেখে দিই?

কেন, কথা বলতে বিরক্তিবোধ করছেন বুঝি?

না, তা নয়। কাসেদ ইতস্ততঃ করে বললো, অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা আটকে রেখেছি কিনা।

বুঝলাম। শিউলি মৃদু গলায় বললো, ফোনটা কষ্ট পাচ্ছে, রেখে দিন। বলে আর দেরি করলো না সে। রিসিভারটা রাখার শব্দ শুনতে পেল সে।

দু'টার পর থেকে অফিসে আর কারো মন বসতে চায় না।

কখন চারটা বাজবে আর কখন তারা এই চেয়ার-টেবিল আর ফাইলের অরণ্য থেকে বেরিয়ে বাইরে মুক্ত আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াবে সে চিন্তায় সবার মন উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে।

দুটো থেকে চারটের মাঝখানকার সময়টা তাই কাজের চেয়ে আলাপ-আলোচনা আর গল্প করেই কাটে বেশির ভাগ সময়।

এ সময় হেড ক্লার্কের পানের ডিবে দ্রুত ফুরিয়ে আসতে থাকে। হয়তো তাই কথা বলার মাত্রা বেড়ে যায়। মেজাজ রুক্ষ থাকলে সকলকে গাল দেয়। প্রসন্ন থাকলে সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে। সকলের কুশল জিজ্ঞেস করে। আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরুবার আগে হেড ক্লার্ক বললেন, আজ আপনি আমার বাসায় যাবেন কাসেদ সাহেব, আপনার ছাতাটা নিয়ে আসবেন। শুনছেন?

কাসেদ বললো, আমি তো আপনার বাসা চিনি না।

চেনেন না, চিনে নেবেন। পান চিবুতে চিবুতে হেড ক্লার্ক আবার বললেন, চলুন না আমার সঙ্গে আজ যাবেন বাসায়। বিকেলে বিশেষ কারো সঙ্গে কোন এনগেজমেন্ট নেই তো? শেষের কথাটার ওপর যেন তিনি বিশেষ জোর দিলেন।

কাসেদ মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে। হেড ক্লার্কের কথা বলার ভঙ্গীটা ভালো লাগলো না ওর। ভেবেছিলো চুপ করে যাবে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু বাড়াতে হলো, আমার বিশেষ কেউ আছে সেটা আপনি জানলেন কোত্থেকে?

আহা, রেগে গেলেন নাকি? হেড ক্লার্ক পরক্ষণে বললেন, কথাটা যদি বলেই থাকি এমন কি অন্যায় করেছি বলুন? এ বয়সে সবার বিশেষ কেউ একজন থেকে থাকে, আমাদেরও ছিলো। ক্ষণকাল থেমে আবার শুধোলেন তিনি, আপনার বুঝি কেউ নেই?

থাকলেই-বা আপনাকে বলতে যাবে কে? কাসেদের হয়ে জবাবটা দিলেন এক নম্বর কেরানী।

হেড ক্লার্ক সরোষ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন, আপনাকে যে কাজটা করতে দিয়েছি ওটা হয়েছে?

এক নম্বর কেরানীর মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেলো।

হেড ক্লার্ক মুখে একটা পান তুলে দিয়ে বললেন, আগে কাজ শেষ করুন, তারপর কথা বলবেন।

ঘাড় নিচু করে কাজে মন দিলো এক নম্বর কেরানী।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

হেড ক্লার্ক চুপ।

কাসেদ নীরব।

দেয়ালে ঝুলান বড় ঘড়িটা শুধু আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে।

আর কোন শব্দ নেই।

অফিস থেকে দু'জনে এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো ওরা।

দু'জন গম্ভীর।

রাস্তায় নেমে এসে কাসেদ প্রথমে কথা বললো, আপনি কি এখন সোজা বাসায় যাবেন?

গুমোট অবস্থাটা কেটে যাওয়ায় যেন খুশি হলেন ভদ্রলোক, অফিস থেকে বেরিয়ে আমি অন্য কোথাও যাইনে।

কাসেদ বললো, বেশ তাহলে চলুন আপনার বাসায় যাওয়া যাক।

বলে হেড ক্লার্কের মুখের দিকে তাকালো কাসেদ। তাঁর কোন ভাবান্তর হয়েছে কিনা লক্ষ্য করলো, কিন্তু কিছু বুঝা গেল না।

হেড ক্লার্ক মৃদু গলায় বললেন, বেশ তো চলুন। আপনার ছাতাটা- বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি, কথাটা শেষ করলেন না।

অফিস থেকে মকবুল সাহেবের বাসাটা বেশ দূরে নয়, তবু অনেক দূর। পল্টন থেকে লালবাগ।

মাসের শুরুতে বাসে চড়ে অফিসে আসেন তিনি। বাসে চড়ে বাসায় ফেরেন। মাসের শেষে বাস ছেড়ে পদাতিক হন। হেঁটে আসেন, হেঁটে যান। কিছুদূর এসে মকবুল সাহেব বললেন, আমি পারতপক্ষে বাসে চড়িনে বুঝলেন। ওতে বড় ভিড়, আমার মাথা ঘুরোয়। আগে রিক্সায় করে আসতাম যেতাম। কিন্তু ব্যাটারা এমন হুড়মুড় করে চালায়, দু'বার ট্রাকের নিচে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। সেই থেকে আর রিক্সায় চড়িনে। আজকাল শ্রীচরণ ভরসা করেছি। এতে কোরে বিকেল বেলায় বেড়ানোটাও হয়ে যায়।

কি বলেন?

তাকে সমর্থন জানাতে গিয়ে শুধু একটুখানি হাসলো কাসেদ, কিছু বললো না। কারণ কিছু বলতে গেলে বিকেল বেলায় বেড়ানোর চেয়ে টাকাকড়ির সমস্যাটা এসে পড়ে সবার আগে।

লালবাগে একটা সরু গলির ভেতরে একখানা আস্তর উঠা একতলা দালান, আর একটা দোচালা টিনের ঘর নিয়ে থাকেন মকবুল সাহেব। বড় পরিবার। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি।

বাইরের একখানা ঘর বৈঠকখানা এবং স্কুল পড়ুয়া দুই ছেলের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চেয়ে ধুলোবালি আর আবর্জনার আধিপত্য সবার আগে চোখে পড়ে। জানালা দু'খানায় পর্দা সেই কবে লাগানো হয়েছে কে জানে। নিচের দিক থেকে কিসে যেন খেয়ে অর্ধেকটা করে ফেলেছে। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে সেগুলো। আর কিছু নয়, শুধু ওই পর্দাগুলোর দিকে তাকালেই গৃহকর্তার দীনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভেতরে ঢুকে একখানা চেয়ারে ওকে বসতে বললেন মকবুল সাহেব। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে পঞ্চাশোত্তর বৃদ্ধ এখন ক্লান্ত। কাসেদকে বসতে বলে নিজে একখানা চৌকির উপর বসে পড়লেন। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, বাড়িটা বিশেষ ভাল না। তবু, সেই পার্টিশানের পর থেকে আছি, একটা মায়া বসে গেছে। ছাড়ি ছাড়ি করেও ছাড়া যায় না।

বাইরের ঘরে তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতরে থেকে কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে জুটলো এ-ঘরে। কারো পরনে ময়লা ফ্রক, কারো পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, কেউ-বা ন্যাংটা।

বুড়ো মকবুল উঠে গিয়ে তাদের দু'জনকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর চোখমুখে চিবুকে চুমু দিয়ে একগাল হেসে বললেন, এরা সব আমার নাতি নাতনি। বিকেলটা এদের নিয়ে কাটে আমার। বুড়োর চোখে-মুখে কি এক প্রশান্তি। এ মুহূর্তে যেন নিজের সকল দীনতা ভুলে গেছেন তিনি। চেয়ে দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো কাসেদের। কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ নজরে এলো, জানালায় ঝোলানো আধখানা পর্দার ওপাশে একটি মেয়ে এদিকে পিছন করে আছে। কালো ঘন চুলগুলো তার পিঠময় ছড়ানো। গায়ের রংটাও কালো। চিকন হাত জোড়া দিয়ে চুলের অরণ্যে উকুন খুঁজছে সে। চেহারাটা ভাল করে দেখবার উপায় নেই। পাশ থেকে যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল নাকটা বেশ তীক্ষ্ণ আর চোখজোড়া বড় বড়।

মকবুল সাহেব তার নাতি নাতনিদের নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

জানালার পাশ থেকে চোখজোড়া সরে এসেছিলো, আবার সেদিকে তাকালো কাসেদ। মেয়েটি এখনো বসে আছে। মকবুল সাহেবের মেয়ে। হয়তো সবার বড়। কিম্বা মেজো, কিম্বা সেজো। বিকেল বেলার ম্লান আলোয় ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে সে। একটু পরে তাকে আর দেখা যাবে না। কালো মেয়ে সন্ধ্যার আলোতে হারিয়ে যাবে।

কাসেদ নিজেও জানে না, কখন সে জানালার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিলো, ঔৎসুক্যে আনত দেহ সহসা সচকিত হলো। মনে মনে লজ্জা পেলো কাসেদ। একটা অপরিচিত মেয়েকে দেখার জন্যে অমন করছে কেন সে? এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না। সে জানে মেয়েটাকে দেখতে তার ইচ্ছা করছে, ভালো লাগছে, সুন্দর লাগছে। অন্তত বিকেলের এই বিশেষ মুহূর্তটিতে। এ যে কাসেদ সাহেব, আপনাকে অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করেন নি তো? মকবুল সাহেব এসে ঢুকলেন ভেতরে। পানে মুখখানা ভরে এসেছেন তিনি। হাতে একখানা ছাতা। ছাতাটার দিকে চোখ পড়তে কাসেদ চিনলো। তার ছাতা। কিন্তু যেমনটি ছিলো তেমনটি নেই। উপরে, নিচে, মাঝখানে অনেকগুলো ক্ষত। মকবুল সাহেব একবার ছাতা আর একবার কাসেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বললেন, ছাতাটা আপনাকে দেয়া গেলো না কাসেদ সাহেব, ওটা মেরামত করতে হবে।

কাসেদ পরক্ষণে বললো, ঠিক আছে, আমি নিজেই মেরামত করে নেবো।

মকবুল সাহেব বললেন, না, না, তা কেমন করে হয়। বলতে গিয়ে মুখখানা বিরক্তিতে ভরে এলো তার। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই ছেলে পিলেদের নিয়ে আর পারা গেলো না। একটা জিনিস এদের জন্যে ঠিক থাকে না, এত মারধোর করি– সহসা দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন তিনি।

দরজার ঝুলান ময়লা পর্দাটা ঈষৎ নড়ে উঠলো।

কে যেন পাশে দাঁড়িয়ে।

অন্ধকারে তাকে ঠিক দেখা গেলো না।

চুড়ির আওয়াজ শুনে মনে হলো একটি মেয়ে।

হয়তো সেই মেয়েটি, যে একটু আগে আঙ্গিনার পাশে বসে বসে মাথায় উকুন খুঁজছিলো।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

মকবুল সাহেব হাতের ছাতাখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পর্দার ওপাশ থেকে একখানা শীর্ণ হাত বেরিয়ে এলো সামনে। এক পেয়ালা চা আর একটা পিরিচে কিছু মিষ্টি।

হাতজোড়া সরে গেলো।

পর্দাটি ঈষৎ নড়ে উঠলো আবার।

কাপ আর পিরিচখানা সামনে নামিয়ে রাখলেন মকবুল সাহেব। বললেন, গরিবের বাসায় এসেছেন– কথাটা শেষ করলেন না তিনি। এ ধরনের কথা সাধারণত শেষ করা হয় না।

চায়ের কাপটা নীরবে সামনে টেনে নিলো কাসেদ।

চা খেয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে।

জাহানারাদের ওখানে অনেকদিন যাওয়া হয় নি।

আজ রাতে, এমনি রাতে একবার গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু জাহানারা সেতার শেখবার জন্যে একটা মাস্টার রাখার কথা বলেছিলো। গেলেই হয়তো প্রশ্ন করবে, কই আমার মাস্টার ঠিক করেন নি?

জবাবে কোন রকমের অজুহাত দেখানো যাবে না। বলা যাবে না, কাজের চাপ ছিলো কিম্বা সময় করে উঠতে পারিনি। তাহলে হয়তো অভিমান করে বসবে সে। বলবে, আমার জন্যে না হয় কাজের একটু ক্ষতিই হতো।

মেয়েরা এমনি হয়। তারা যাকে ভালবাসে তাকে বড় স্বার্থপরের মত ভালবাসে।

লালবাগের চৌরাস্তায় এসে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ। যাবে কি যাবে না।

রাস্তার মোড়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে একখানা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো সে। বসবার জায়গা নেই। রড ধরে এখানেও দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে।

জাহানারাদের বুড়ো চাকরানীটা বারান্দায় বসে বসে কি যেন সেলাই করছিলো।

কাসেদকে দেখে একগাল হেসে বললো, আপা মাস্টারের কাছে সেতার শিখছে।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো কাসেদ। তাহলে জাহানারা কাসেদের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একজনকে খুঁজে নিয়েছে। নিজেকে এ মুহূর্তেও বড় অপরাধী মনে হলো তার। কাসেদের জন্যে অপেক্ষা করে হয়তো হতাশ হয়ে পড়েছিলো জাহানারা। অবশেষে নিজেই একজনকে খুঁজে নিয়েছে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে বুড়ো চাকরানীটা কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, তারপর মৃদু হেসে সেলাইয়ে মনোযোগ দিলো আবার।

বুড়ির সামনে সহসা অস্বস্তি বোধ করলো কাসেদ।

জাহানারার ঘর থেকে সেতারের টুং টাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর মৃদু হাসির শব্দ।

সেতার শিখতে বসে হাসছে জাহানারা। কেন?

সেতারের সঙ্গে হাসির কোন সম্পর্ক নেই।

দোড়গোড়ায় একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়লো কাসেদ।

মেঝের উপর একখানা ফরাস পেতেছে জাহানারা। একপাশে একটা সেতার হাতে সে বসে; অন্য পাশে ফর্সা রঙের রোগা পাতলা একটি ছেলে। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

কাসেদ ভেতরে ঢুকতেই সেতারের ওপর ধরা হাতখানা সহসা থেমে গেলো। কাসেদের চোখের দিকে এক পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো জাহানারা। তারপর হেসে দিয়ে বললো, আপনি? এতদিন আসেন নি যে?

কাসেদ সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না। কিছু বলতে গিয়েও পাশে বসা ছেলেটির দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

জাহানারা বললো, উনি আমাকে সেতার শেখাচ্ছেন।

দু'জনে হাত তুলে আদাব বিনিময় করলো ওরা।

কাসেদ বললো, ওনার কথা আগেই শুনেছি।

জাহানারা কৌতূহলভরা চোখে তাকালো ওর দিকে, কার কাছ থেকে শুনেছেন?

কাসেদ বললো, বুড়ির কাছ থেকে।

জাহানারার সেতারের মাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তাহলে আমি এখন যাই। আপনাদের গুরুছাত্রীর সাধনায় অকারণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। ওর গলার স্বরে অসতর্ক অভিমান ঝরে পড়লো।

পরক্ষণে নিজেই সেটা বুঝতে পারলো কাসেদ। লজ্জায় দু'জনের কারো দিকে তাকাতে পারলো না সে।

জাহানারা স্থিরচোখে ওর দিকে তাকিয়ে। একটু আগে মৃদু হাসছিল সে, এখন তার লেশমাত্র নেই। মাস্টার বললেন, একটু বসে গেলেই পারেন। আপনার উপস্থিতি আমাদের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। বলে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসি নয়। এ যেন কাসেদকে বিদ্রুপ করা হলো।

জাহানারা অত্যন্ত শান্ত গলায় বললো, জানেন তো সাধনার সময় আশ-পাশের কারো অস্তিত্বের কথা সাধকের মনে থাকে না। আমরাও আপনার উপস্থিতির কথা ভুলে যাবো।

কি বলেন? বলে নতুন মাস্টারের দিকে তাকালো জাহানারা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসলো। যেন অনেকদিনের চেনাজানা। অনেক কালের আপনজন।

কাসেদ বসলো নীরবে।

আজকের এই রাতে না এলেই ভালো হতো। কেন আসতে গেলো সে?

স্নেহ-প্রেম ভালবাসা এর মূল্য নেই।

এর কোন অর্থ নেই কেরানী জীবনে।

জাহানারা। এ কি করলে তুমি জাহানারা। যে তার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তোমাকে ভালবাসলো তার কথা তুমি একটুও ভাবলে না। একটিবার স্মরণ করলে না তাকে যে গোপনে তোমাকে নিয়ে অশেষ স্বপ্ন এঁকেছে মনে মনে। দু'দিনের পরিচয়ে যাকে পেলে, তাকেই ভালবেসে ফেললে তুমি?

ভালো বলেই ওকে আমি ভালবেসেছি। জাহানারার গলার স্বর তীব্র এবং তীক্ষ্ণ শোনালো কানে।

কিন্তু ও যে ভালো এ কথা কেমন করে বুঝলে? ক'দিন ওর সঙ্গে মিশেছো তুমি? ওর কতটুকু তুমি জানো? ও একটা ঠগ হতে পারে, জোচ্চোর হতে পারে। তোমার ফুলের মতো পবিত্র জীবন নিয়ে হয়তো ছিনিমিনি খেলতে পারে সে।

যদি খেলেই তাতে আপনার কিবা এলো গেলো।

হয়তো কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু জাহানারা, তুমি বাচ্চা খুকী নও, বোঝার মত বয়স হয়েছে তোমার। যে চরম সিদ্ধান্ত তুমি নিতে চলেছো, তার আগে কি একটুও ভাববে না, চিন্তা করবে না?

চিন্তা আমি করিনি সেকথা কেমন করে বুঝলেন? জাহানারা হাসলো।

হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বলতে পারলো না কাসেদ।

হঠাৎ সুর কেটে গেলো।

জাহানারা বললো, একি, সাধনা না হয় আমরা করছি। কিন্তু আপনি তন্ময় হয়ে আছেন কেন?

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, একটা কবিতার বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম।

ও, তাহলে আপনি কবিতার ভাবে মগ্ন ছিলেন। আমি ভাবছিলাম বুঝি সেতারের সুর শুনে।

মাস্টার সবিনয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাহলে এখন চলি?

জাহানারা ঘাড় দুলিয়ে বললো, কাল আসছেন তো?

হ্যাঁ, আসবো।

দেখবেন, আবার ভুলে যাবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

আপনি সব ভুলে যান কিনা, তাই বললাম। মাস্টারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলো জাহানারা।

ও ফিরে এলে কাসেদ বললো, আমি চলি।

যাবার জন্যে অমন উতলা হয়ে গেলেন কেন? আপনি এসেছেন বলেই তো মাস্টারকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলাম। জাহানারা মৃদু গলায় বললো, এখানে চুপটি করে বসুন। আমি দু'কাপ চা করে নিয়ে আসি। আমি না আসা পর্যন্ত যাবেন না যেন। শাসনের ভঙ্গিতে ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল জাহানারা।

ওর শেষ কথাগুলো মুহূর্তে শান্ত করে দিয়ে গেলো তাকে। তাহলে এতক্ষণ যা নিয়ে এত চিন্তা করছিলো সে, তার কোনটাই সত্য নয়।

কাসেদের সঙ্গে কথা বলবে বলে মাস্টারকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়েছে জাহানারা।

জাহানারা তুমি বড় ভালো মেয়ে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তাইতো তোমাকে এত ভাল লাগে। ভালবাসি।

দু'কাপ চা হাতে ওর সামনে এসে বসলো জাহানারা।

চা আনতে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এসেছে সে।

শাড়িটা পালটেছে।

চুলে চিরুনি বুলিয়েছে কয়েক পোঁচ।

কাসেদ বললো, তাহলে সেতারের মাস্টার ঠিক করেই ফেললেন আপনি? আপনার অপেক্ষায় আর কতকাল বসে থাকবো। চায়ের কাপটা টেনে নিতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠলো কাসেদের।

বাইরে রাত।

ভেতরে দু'জন নীরবে বসে।

আশেপাশে কারো কোন সাড়া শব্দ নেই।

সমস্ত পৃথিবী যেন চুপ করে আড়ি পেতে আছে ওরা কি বলে শুনবার জন্য। কাসেদ বললো, আপনার আঙ্গুলে একটা কালো দাগ পড়ে গেছে।

জাহানারা বললো, সেতার শিখতে গেলে প্রথম প্রথম অমন হয় শুনেছি।

কাসেদ বললো, হুঁ।

আবার দু'জনে চুপ করে গেলো ওরা।

বাইরে তারা জ্বলছে, ভেতরে বাতি।

কাসেদ ভাবলো, জাহানারাকে মন খুলে আজ সব কিছু বললে কেমন হয়।

এখানে কেউ নেই।

এইতো সময়।

কাপটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখলো কাসেদ।

জাহানারা নীরবে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

সেও কিছু বলতে চায় ওকে।

সে বলুক। প্রথম সেই বলুক। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

জাহানারা বললো, আপনি যেন আগের চেয়েও শুকিয়ে গেছেন।

কাসেদ বললো, মা-ও তাই বলেন।

হ্যাঁ, মা কেমন আছেন?

ভালো।

নাহার?

সেও ভালো।

আপনার শরীর কেমন?

মোটামুটি যাচ্ছে।

আবার নীরবতা। শূন্য চায়ের কাপ দুটো সামনে নামিয়ে রেখেছে ওরা। ওরা এখন মুখোমুখি বসে। জাহানারা জানালার দিকে তাকিয়ে। হয়তো আকাশ দেখছে কিম্বা আঁধারের আলো। কাসেদ দেখছে জাহানারাকে। ওর চোখ, ওর মুখ, ওর চিবুক।

কি সুন্দর।

আমাকে কিছু বললেন, জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে ওর দিকে তাকালো জাহানারা।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো কই না নাতো।

জাহানারা মৃদু হাসলো। কিছু বললো না।

জাহানারা। আস্তে করে ওকে ডাকলো কাসেদ।

বলুন। চাপা স্বরে জবাব দিলো জাহানারা।

আমি এখন চলি।

সেকি, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন? অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো জাহানারা। যেন এমন কিছু একটু আগেও সে ভাবতে পারে নি। যেন এ সময় চলে যাওয়াটা কোনমতে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাসেদ বললো, অনেকক্ষণ বসা হলো। আর কত?

জাহানারা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললো, আচ্ছা।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। এ মুহূর্তে ওকে বড় দুর্বল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে শরীরটা যেন ক্লান্তির ভারে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। বাইরে বারান্দা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলো জাহানারা।

আবার আসছেন তো?

আসবো।

বাইরে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে একটা জোর শ্বাস নিলো কাসেদ।

দিন কয়েক পরে নিউ মার্কেটের মোড়ে শিউলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো ওর। শিউলির পরনে বাদামী রঙের একখানা শাড়ি। চুলগুলো খোঁপায় বাঁধা। হাতে একটা কাপড়ের থলে।

আপনি বেশ মানুষ তো, অনুযোগ ভরা কণ্ঠে শিউলি বললো, এত করে বললাম শুক্রবার দিন গেটের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, কই আপনি এলেন না তো? সারাটা বিকেল শুধু ঘর-বার করেছি। শিশুসুলভ হাসিতে সারা মুখ ভরে এলো তার।

কাসেদ আস্তে করে বললো, ভুলে গিয়েছিলাম ।

ভুলে তো যাবেনই। আমি আপনার কে যে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা আপনার মনে থাকবে। গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল তার।

শিউলির সঙ্গে পরিচয়ের পর এই প্রথম চমকে উঠলো কাসেদ। ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে। কি বলতে চায় শিউলি।

কি বলতে চায় সে?

সেই পুরোনো সুরে সহসা হেসে উঠলো শিউলি। আমার দিকে অমন করে চেয়ে থাকবেন না কিন্তু। সুন্দর চোখের চাউনি আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। কে বললো আমার চোখ দু'টি সুন্দর। কাসেদ তখনো ওর দিকে তাকিয়ে। হাতের ব্যাগটা সজোরে দুলিয়ে শিউলি বললো, শুধু কি সুন্দর, অদ্ভুত মায়াময় চোখ দুটো আপনার, দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

তাই নাকি? বলতে গিয়ে ঢোক গিললো কাসেদ।

শিউলি হাসছে।

সেই পুরনো হাসি।

রাস্তার মোড়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে দেখে আশপাশের লোকজন আড়চোখে লক্ষ্য করছিলো ওদের। ওদের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না কাসেদের।

শিউলিকে সজাগ করে দিয়ে কাসেদ বললো, আপনি সত্যি একেবারে ছেলে মানুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত জোরে হাসছেন কেন?

শিউলি হাসি থামিয়ে বললো, আপনি বুঝি চাপা হাসি পছন্দ করেন?

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশিদূর এগুতে ইচ্ছে করলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, মার্কেটিং করতে এসেছিলেন বুঝি?

শিউলি হাতের থলেটি দেখিয়ে বললো, হ্যাঁ।

এখন কি হোস্টেলে ফিরবেন?

ইচ্ছে তাই ছিলো কিন্তু এখন আর ফিরছি নে।

তাহলে কি করবেন? একটু অবাক হয়ে শিউলির দিকে তাকালো কাসেদ। শিউলি নির্বিকার গলায় বললো, আপনার সঙ্গে ঘুরবো, বেড়াবো, গল্প করবো। কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, কিন্তু আমি এক বন্ধুর বাসায় যাব ভাবছিলাম।

ঠিক আছে, সঙ্গে আমিও যাবো। শিউলি পরক্ষণে বললো, আপনার বন্ধুটি নিশ্চয়ই আমাকে বের করে দেবেন না।

না, তা কেন করবে, কিন্তু–

আপনার আপত্তি আছে এই তো। শিউলি মুখ টিপে হেসে বললো, বন্ধুর ওখান থেকে কোথায় যাবেন শুনি?

বাসায় ফিরবো।

বাহ্ কি মজা। হঠাৎ যেন হাততালি দিতে ইচ্ছে করলো শিউলির , আনন্দে আটখানা হয়ে বললো, আপনাদের বাসায়ও যাওয়া যাবে আজ। একবার চিনে আসি তো, তারপর আপনার সঙ্গে দেখা হোক না হোক বাসায় গিয়ে হামলা করবো।

কাসেদ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, তারচে এক কাজ করুন, হোস্টেলে ফিরে যান আজ। অন্যদিন নিয়ে যাব বাসায়।

মুখখানা কালো করে ওর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো শিউলি। অদ্ভুত করে একটুখানি হাসলো সে। ধীরে ধীরে বললো, কোন কিছুতে অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখানোটা বোকামো। যাকগে, আপনার বাসায় যাবার স্পৃহা আমার আর নেই। চলি। হোস্টেলের দিকে পা বাড়ালো শিউলি। প্রথমে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেলো কাসেদ। পর মুহূর্তে কয়েক পা এগিয়ে ডাকলো, এই যে শুনুন। শিউলি ফিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললো, কিছু বলার থাকলে বলুন। আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাতজোড়া কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে, একটা হাত নিজের চুলের মধ্যে বুলোতে বুলোতে আর অন্যটা দিয়ে শিউলির ব্যাগটা টেনে ধরে কাসেদ আস্তে করে বললো, বলছিলাম কি চলুন।

কোথায়? একটু অবাক হলো শিউলি।

কাসেদ বললো, কেন আমাদের বাসায়।

ওর মুখের দিকে আবারো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শিউলি। একটা সুন্দর হাসির তরঙ্গ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, হেসে দিয়ে শিউলি বললো, এতক্ষণ এত ঢং করছিলেন কেন শুনি?

কাসেদ নিরুত্তর রইলো।

বাসায় এসে ওর বইপত্র খাতাগুলো ছড়িয়ে একাকার করলো শিউলি।

এক একটা করে খুললো, পড়লো, বন্ধ করে আবার খুললো সে।

হঠাৎ তালাবদ্ধ সুটকেসটার দিকে চোখ পড়লে বললো, দেখি, চাবিটা দেখি আপনার?

কাসেদ বললো, কেন চাবি দিয়ে কি করবেন আপনি?

সুটকেসটা খুলবো।

কেন?

খুলে দেখবো ওর মধ্যে কি আছে। শিউলির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য নির্লিপ্ত।

কাসেদ বললো, না, ওটার চাবি আমি কাউকে দিই না।

ও, ভ্রূজোড়া বিস্তারিত করে ঈষৎ হাসলো। সামনে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললো, ওর মধ্যে প্রেমপত্রগুলো সব লুকিয়ে রেখেছেন বুঝি? তাহলে থাক।

ওসব কাউকে না দেখানোই ভালো। হাসতে হাসতে আবার টেবিলটার দিকে সরে গেলো শিউলি।

ও চলে গেলে মা শুধোলেন, মেয়েটি কে রে?

কাসেদ বললো, জাহানারার চাচাত বোন।

মা বললেন, ও তাই, গলার স্বরটা অনেকটা জাহানারার মত।

মেয়েটি কি করে?

কলেজে পড়ে।

এখানে বুঝি বাসা আছে ওদের।

না। ও হোস্টেলে থাকে।

মা তবু এত কথা জিজ্ঞেস করলেন, নাহার একটি কথাও জিজ্ঞেস করলো না। ওরা যখন ভেতরের ঘরে বসে কথা বলছিলো তখন নিজ হাতে চা বানিয়ে ওদের দিয়ে গেছে নাহার। আর কিছু লাগবে কিনা, কথা না বলে ইশারায় কাসেদকে প্রশ্ন করেছে। তারপর কাসেদ যখন শিউলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওর, তখনো উত্তরে একটা ছোট্ট আদাব জানিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেছে নাহার। ওর ব্যবহারটা বড় অসামাজিক বলে মনে হলো কাসেদের।

শিউলি চলে গেলে নাহারকে ডাকলো সে, আচ্ছা, তোমার একি স্বভাব বলতো? একজন ভদ্রমহিলা বাসায় এসেছে, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, পরিচয় করিয়ে দিলাম, দু'চারটে কথা বলবে, একটু আলাপ করবে, তা নয়, একেবারে চুপ। তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হয় নাকি। বুড়ো-আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে নাহার জবাব দিলো, আলাপ করার কিছু থাকলে তো। বলে এলোমেলো করে রাখা বইগুলো গুছাবার কাজে লেগে গেলো নাহার। একটার পর একটা, বইগুলো আবার সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছে সে। কাসেদ চুপ করে রইলো। আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

দুটো ঘটনাই পর পর ঘটলো।

আগের দিন পুরো অফিসটা একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগেছে। কারণটা তেমন অভাবিত কিছু নয়। বড় সাহেবের সঙ্গে তার বউয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বউ ডিভোর্স করেছে তাঁকে। হাজার হোক অফিসের বড় সাহেব, তাকে নিয়ে হাসির হুল্লোর ছড়ান যায় না। গলা কাটা যাওয়ার ভয় আছে। তবু কর্মচারীরা এ নিয়ে আলোচনা করতে ছাড়ে নি।

অবশেষে এমনি কিছু যে ঘটতে পারে তা সবাই আঁচ করছিলো। যেখানে স্বামী-স্ত্রীতে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, সেখানে সকল সম্পর্ক বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

তবু অনেকে সাহেবের জন্যে আফসোস করলো। বললো, বেচারা।

আবার কেউ কেউ বললো, ভালই হয়েছে, সাহেব বেঁচেছে। নইলে সারাটা জীবন ছারপোকা হয়ে থাকতে হতো।

কেউ বললো, বিয়ে করে বড় ঠকেছে সাহেব। কি লোক ছিলো কেমন হয়ে গেছে।

সাহেবকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ না হতেই পরবর্তী ঘটনাটা ঘটলো।

মকবুল সাহেব, যিনি সারাদিন পান খেতেন আর অফিসটাকে জমিয়ে রাখতেন, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

সেদিন অফিসে এসেই দারোয়ানের কাছ থেকে খবরটা শুনলো কাসেদ। প্রথমে চমকে গিয়েছিলো, পরে সামলে নিয়ে শুধালো, কার কাছ থেকে শুনলে?

দারোয়ান জানালো, তাঁর ছেলের কাছ থেকে।

অফিসের সবাই জেনেছে একে একে।

দুঃখ করেছে, আহা লোকটা বড় ভালো ছিলো। তাদের শোক প্রকাশের ধরন দেখে মনে হলো, যেন বুড়ো মকবুলের মৃত্যু-সংবাদ শুনেছে তারা। তা পক্ষাঘাতে ভোগা আর মারা যাওয়া এক কথা। আফসোস জানাতে গিয়ে একাউন্‌টেন্ট বলেন, যতদিন বেঁচে থাকবে একটানা কষ্ট করতে হবে। কাসেদ শুধালো, এখন তিনি আছেন কোথায়?

কনিষ্ঠ কেরানী বললো, হাসপাতালে। সকালবেলা নাকি মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একাউন্‌টেন্ট বললেন, মেডিক্যাল গেলে কি হবে, ও রোগ ভালো হবার নয়। কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন তিনি। গলাটা অস্বাভাবিক শোনালো। মনে হলো রোগটা না সারুক তাই যেন চান তিনি।

টাইপরাইটারের উপর হাত জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ একাউন্‌টেন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কাসেদ।

মকবুল সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজের দায়িত্ব পড়বে একাউন্‌টেন্ট সাহেবের হাতে। প্রমোশন হবে তাঁর। আয় বাড়বে। পদমর্যাদা বাড়বে।

খোদা করুন তিনি ভালো হয়ে যান তাড়াতাড়ি। কাজের ফাঁকে এক সময় একাউন্‌টেন্ট বললেন, আল্লা তাঁকে আবার আমাদের মাঝখানে ফিরিয়ে আনুক। এটা কি তার মনের কথা? সত্যি কি তিনি মনেপ্রাণে তাই চাইছেন? কাসেদের কেন যেন বিশ্বাস হলো না। মানুষ মাত্র স্বার্থপর। স্বার্থের প্রশ্নের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। বাবাতে ছেলেতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায়।

একাউন্‌টেন্ট সাহেব ভালো করে জানেন, বুড়ো মকবুল যদি সুস্থ হয়ে আবার কাজে ফিরে আসে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা শুভ হবে না। এসব জানা সত্ত্বেও কি তিনি পক্ষাঘাত আক্রান্ত ব্যক্তিটির রোগমুক্তি কামনা করছেন? নাকি, এ তাঁর বাইরের কথা। মনে মনে হয়তো ভাবছেন অন্য কিছু। ভাবছেন বুড়ো আর সুস্থ না হোক। হয় মারা যাক কিম্বা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকুক বিছানায়।

মানুষ তাই চায়। নিজের মঙ্গলের জন্যে অন্যের ক্ষতি চিন্তা করতে সে একটুও বিলম্ব করে না।

কাসেদ কাজে মন বসাতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু বুড়ো মকবুলের কথা বারবার করে মনে হতে লাগলো তার।

বিকেলে অফিস শেষ হবার কিছু আগে বড় সাহেব ডেকে পাঠালো তাকে। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর এ ক'দিন কারো সামনে আসেন নি তিনি। কথা বলেন নি কারো সঙ্গে। অফিসে এসেছেন। থেকেছেন। কাজ করেছেন। কাসেদ যখন বড় সাহেবের রুমে

এসে ঢুকলো, সাহেব তখন একগাদা ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কয়েকবার কাশলো কাসেদ। তবু তিনি তাকাচ্ছেন না দেখে নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলাম দুলছে, দোলনার মত শব্দ হচ্ছে।

বড় সাহেব ফাইলটা বন্ধ করে রাখলেন। তারপর কাসেদের দিকে চোখ পড়তে একটু অবাক হয়ে শুধালেন, আপনি এখানে কেন?

কাসেদ বললো, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাহেব কি যেন ভাবলেন। কপালের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে আসছে তাঁর। দু'চোখে কি এক শূন্যতা।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন সাহেব। বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম। ডেকেছিলাম মকবুল সাহেবের খবর জানতে। ও'র কি খবর?

কাসেদ বললো, আমি ঠিক জানি নে। শুনেছি হাসপাতালে আছেন। মেডিক্যাল কলেজে।

হুঁ। টেবিলের উপর ছড়ানো কয়েকখানা কাগজ ফাইলের মধ্যে রেখে দিতে দিতে সাহেব শুধালেন, আপনার কি এখন কোন কাজ আছে?

না।

তাহলে চলুন একবার হাসপাতালে যাওয়া যাক। টেবিলের ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে রেখে উঠে দাঁড়ালেন বড় সাহেব।

হাসপাতালে মকবুল সাহেবের বেডটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সতেরো নম্বর বেড।

দূর থেকে কাসেদ দেখতে পেলো বিছানার চারপাশে মকবুল সাহেবের বউ এবং ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বড় সাহেব চাপা গলায় শুধোলেন, এখন কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে?

কাসেদ কি বলবে ভাবছিলো, এমন সময় মকবুল সাহেবের স্ত্রীর চোখ পড়লো এদিকে।

এদের সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

বড় ছেলে সামনে এগিয়ে বিনীত স্বরে বললো, আসেন স্যার।

সাহেব যেতে যেতে শুধোলেন, এখন উনি কেমন আছেন?

আগের চেয়ে কিছুটা ভাল আছেন স্যার।

ওরা বেডের যে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তার অন্য পাশে পাশাপাশি তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তিনজনের মাথায় ঘোমটা টানা।

প্রথম জনের কোলে একটি বাচ্চা মেয়ে। হয়তো সে সবার বড়। বিবাহিতা। দ্বিতীয় জনের বয়স কুড়ি একুশের মতো হবে। মুখখানা ভালো করে দেখতে না পেলেও কাসেদের চিনতে ভুল হয় না।

এই সেই মেয়ে যাকে বিকেলে বাড়ির আঙ্গিনায় বসে থাকতে দেখেছিলো সে। তৃতীয় মেয়েটির গায়ের রঙ ওদের চেয়েও ফর্সা। বয়স অল্প।

সাহেব অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মকবুল সাহেবের কপালে একখানা হাত রাখলেন। চোখ মেলে তাকালেন মকবুল সাহেব।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সাহেবের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে শুধু। যেন কিছু বলতে চান তিনি।

সাহেব মৃদু গলায় বললেন, চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবেন।

মকবুল সাহেবের খোলা চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

ওপাশে দাঁড়ান তিনটি মেয়ে আর তাদের মা আঁচলে চোখ মুছলো।

ওরাও কাঁদছে।

কাঁদছে না শুধু ছেলেরা।

ওদের সারা মুখ ম্লান। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু চোখে অশ্রু নেই। সাহেব বললেন, চাকরীর জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা আপনারই থাকবে, কিছুদিন পর ভালো হয়ে গেলে আবার জয়েন্ট করবেন।

মকবুল সাহেব আবার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। বলতে পারলেন না, ওপাশে দাঁড়ান স্ত্রী-কন্যার ওপর চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে আবার বড় সাহেবের দিকে তাকালেন তিনি। পলক পড়ছে না চোখের।

শুধু পানি ঝরছে আর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

সাহেব বললেন, টাকা-পয়সার কথা ভাবতে হবে না। আমি বন্দোবস্ত করে দেবো।

এবার, এতক্ষণে কান্না কমে এল তার। যেন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন তিনি।

কাসেদকে দেখলেন। দেখলেন চারপাশে।

কাসেদের দিকে মুখখানা এনে বড় সাহেব চাপা স্বরে বললেন, এদের দেখাশোনার দায়িত্বটা আপাততঃ আপনাকেই নিতে হবে।

কাসেদ সম্মতি জানিয়ে মাথা নত করলো।

সাহেব আবার বললেন, আমি অফিস থেকে কিছু টাকা স্যাঙ্কশন করিয়ে দেবো। প্রয়োজন মত খরচ করবেন।

কাসেদ আবার মাথা নোয়ালো।

একটা নার্স টেম্পারেচার নিয়ে গেলো। তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি যেন আলাপ করলেন বড় সাহেব।

মকবুল সাহেবের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এসে সেই মেয়েটিকে দেখতে চেষ্টা করলো কাসেদ।

দেখা গেলো না।

সন্ধ্যার মত আবছা-ই রয়ে গেলো সে।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে দিলেন সাহেব। বললেন, এগুলো হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আপনি বাসায় চলে যান।

ফলের ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়ে চলে আসছিলো কাসেদ।

সাহেব পিছন থেকে আবার ডাকলেন, বললেন, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। সাহেবের গলার স্বরটা কেমন যেন ক্লান্ত আর জড়ানো। কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে।

গাড়ি আছে। বাড়ি আছে। চাকরী আছে ভালো, টাকা-পয়সার অভাব নেই তবু সুখী হতে পারলো না লোকটা।

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওঁর দিকে। কিছু বললো না। পুরো অফিসটা চাপা কথার গুমোট হাওয়ায় ভরে আছে সেই সকাল থেকে।

মকবুল সাহেব। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত মকবুল সাহেব কি ভালো হবেন?

এ রোগ তো ভালো হবার নয়। আর তিনি যদি ভালো না হন তাহলে তার জায়গায় নিশ্চয় এই অফিসের একজনকেই নেয়া হবে। কাকে নেবে কিছু জানেন? এক নম্বর কেরানী চাপাস্বরে শুধোলেন দু'নম্বর কেরানীকে।

দু'নম্বর কি বললেন কিছু শোনা গেলো না।

দুপুরে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন তাকে।

কিছু টাকা দিলেন।

খোঁজখবর নিলেন।

বললেন, আমি অবশ্য বিকেলের দিকে একবার যাবো।

কাসেদও ভাবছিলো বিকেলে একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসবে লোকটাকে।

লোকটাকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহের আড়ালে আরেকটি বাসনা লুকিয়ে ছিলো। সেই মেয়েটিকে দেখবে। বিকেলের রঙে যার দেহ রাঙানো। কিন্তু অফিস ছুটি হবার একটু আগে সালমা এসে হাজির।

মুখখানা গম্ভীর। কালো। চুলগুলো এলোমেলো। চোখে চরম বিতৃষ্ণা। কাসেদ চমকে উঠলো। কি ব্যাপার, হঠাৎ অফিসে?

সালমা বললো, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

কাসেদ বললো, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

সালমা বললো, এখানে একগাদা লোকের সামনে কিছু বলতে পারবো না আমি। তোমার কি বাইরে আসতে অসুবিধা হবে?

না, অসুবিধা কিসের। এইতো একটু পরেই অফিস ছুটি হবে, তারপর বাইরে বেরুনো যাবে খ'ন। কিন্তু অমন কি ঘটলো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। তোমাকে যেন একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

ক্লান্ত বইকি, সালমা চাপাস্বরে বললো, বড় ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। শেষের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেলো না।

কাসেদ বুঝলো, কিছু একটা ঘটেছে। হয়তো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে সে। কিম্বা মা-বাবার সঙ্গে।

অফিসে আর কোন আলাপ হলো না।

রাস্তায় নেমে কাসেদ বললো, কি দরকার বলো।

সালমা বললো, এই রাস্তায়? চলো না কোথাও গিয়ে বসা যাক।

কোথায় যাবে?

কেন, কোন রেস্টুরেন্টে?

খোলা রেস্তোরায় বসা ঠিক হবে না।

তাহলে কেবিনে বসবে।

কাসেদ ইতস্তত করলো কিন্তু সালমার অনুরোধ এড়াতে পারলো না সে।

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সালমা।

টেবিলের ওপর হিজিবিজি কাটলো।

কাসেদ বললো, কি চুপ করে রইলে যে, কিছু বলবে না?

সালমা একবার আড়চোখে দেখে নিলো তাকে। তারপর বললো, আচ্ছা আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় বলতো?

কাসেদ শুধালো, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

সালমা বললো, না মানে বলছিলাম কি, আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় আমি খুব সুখী?

চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে এনে কাসেদ বললো, এ প্রশ্নের জবাব দেয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ সুখ জিনিসটা হচ্ছে মনের ব্যাপার, ওটা যদি বাইরের হতো, তা'হলে সাদা চোখে দেখা যেতো। তোমার মনকে তো আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে।

দেখবার চেষ্টাই-বা করলে কবে। সালমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ঝরছে, নিজেকে নিয়েই তো ব্যস্ত থাকলে চিরকাল, অন্যের কথা ভাববার অবকাশ কোথায়। কথা বলতে গিয়ে বারবার মুখখানা লাল হয়ে উঠছিলো ওর। কিন্তু কাসেদের দিকে একবারও দেখলো না সে।

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো কাসেদ। বিব্রত গলায় বললো, আমার কথা বাদ দাও। তোমার নিজের কথা কি বলছিলে তাই বলো।

অল্পক্ষণের জন্যে চুপ করে গেলো সালমা।

কাসেদের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারে নি সে।

এক চুমুক চা খেয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সালমা আবার বললো, সব মানুষই জীবনে সুখী হতে চায়। আমিও চেয়েছি। যাকে ভালবাসলাম তাকে পেলাম না। যাকে বিয়ে করতে হলো তাকে ঠিক মনের মতোটি করে পেতে চাইলাম। কিন্তু–

বলতে গিয়ে সহসা থেমে পড়লো সালমা।

মাথার ওপরে ফ্যানটা ঘুরছে জোরে।

এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে বাতাসে।

মুখ খুলে কাসেদের দিকে তাকালো সালমা। আস্তে করে বললো, সে চাইলো আমি তার মতো হই। পাতলা সিফনের শাড়ি পরে ঠোঁটে আর মুখে রঙ মেখে ওর সঙ্গে ক্লাবে যাই। ওর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই, গল্প-গুজব করি। দুই মন, দুই মেরুতে বসে। মিল যেখানে নেই সেখানে সুখের তালাশ করা পাগলামো, তাই না?

কাসেদ কি বলবে ভেবে পেলো না।

সালমা নীরব।

কাসেদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় আছে সে।

কাসেদ বললো, এ নিয়ে চিন্তা করে কি হবে সালমা? এ চিন্তার কি কোন শেষ আছে?

সালমা উত্তরে বললো, বিপাশাকে যদি তোমার কাছে দিয়ে যাই তুমি রাখবে? কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে, কেন বলতো?

সালমা কি যেন ভাবলো। ভেবে বললো, ওকে তোমার কাছে রেখে আমি কোথাও চলে যাবো।

এ পাগলামোর কোন মানে হয় না, কাসেদ্ হাসতে চেষ্টা করলো। বললো, জীবনের পথ যত কঠিন আর যত দুর্যোগময় হোক না কেন, তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ওটা কাপুষতার লক্ষণ।

তাই নাকি? অপূর্ব হাসলো সালমা। টেনে টেনে বললো, কাপুরুষ আমি না তুমি?

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তার মানে?

মানে, তুমি কি বলতে চাও, তুমি একজন বীর-পুরুষ?

কাসেদ হেসে দিয়ে বললো, বীর-পুরুষ হয়তো নই, তবে কাপুরুষও নই।

কাপুরুষ নও? সালমা শব্দ করে হাসলো, তাহলে একটা কথা বলি?

বলো।

সালমা নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি। তারপর টেনে টেনে বললো, আজ এখান থেকে বেরিয়ে, তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে বহু দূরে কোথাও? কাসেদ চমকে উঠলো। সহসা সে বুঝতে পারলো না কি বলবে। কি বলা যেতে পারে। সালমা আবার লাল হলো। মুখখানা সরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

কিছুক্ষণ দু'জনে একেবারে চুপ।

একটু পরে সালমা আবার বললো, কি, চুপ করে রইলে যে, বীর-পুরুষের সাহসে কুলোচ্ছে না বুঝি?

কাসেদ গম্ভীর গলায় বললো, একটা অসম্ভব প্রস্তাব করে বসলে তো আর চলে না। অসম্ভব? টেবিলের উপর ঝুঁকে এলো সালমা, তীক্ষ্ণ গলায় বললো, সাহসে কুলোচ্ছে না তাই বলো। কেন মিছামিছি বাজে অজুহাত দেখাচ্ছো! সালমা নড়েচড়ে বসলো। বেয়ারাকে ডাকো। বিলটা চুকিয়ে দিই।

কাসেদ বললো, কিন্তু কি দরকারী কথা আছে বলেছিলে, তাতো বললে না। সালমা বললো, থাক তার প্রয়োজন আর নেই। যে গাছে প্রাণ নেই তার গোড়ায় পানি ঢেলে কি হবে? খুব তো বড়াই করছিলে কাপুরষ নই, কাপুরুষ নই। সহসা কান্নায় গলাটা ধরে এলো তার।

কাসেদ বললো, অকারণে কেন একটা সহজ সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছো বলো তো? তুমি কি চাও আমার কাছ থেকে?

কিছু না। কিছু না। কিছু না। এতক্ষণে সত্যিকার কান্না নেমে এলো তার দু'চোখ বেয়ে। কাপড়ের আঁচলে অশ্রুবিন্দু মুছে নিতে নিতে সে আবার বললো, কিছুই চাই না, আমি। চাই শুধু ঝগড়া করতে। সারাটা জীবন তাইতো করে এসেছি।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাসেদ। বললো, ওটা বোধ হয় আমাদের কপালে লেখা ছিলো সালমা। নইলে যখনই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমরা ঝগড়া করেছি। করি। কেন করি?

তুমি আমাকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাও, তাই।

কাউকে আঘাত দিয়ে কেউ আনন্দ পায় না সালমা।

সালমা কোন জবাব দিলো না।

পরনের শাড়িটা গুছিয়ে নিতে নিতে উঠে দাঁড়ালো সে।

ওকি, চললে নাকি?

চিরকাল বসে থাকবো বলে এখানে আসি নি নিশ্চয়। সালমার গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালো।

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলো কাসেদ।

সালমা ততক্ষণে কেবিনের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবিন ছেড়ে কাসেদও বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

দিন কয়েক থেকে মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে জ্বর আসে। ছেড়ে যায়। আবার আসে।

এই জ্বরের মধ্যেও মা নামাজ পড়া বাদ দেন নি। পড়েন, বসে বসে।

আর সারাক্ষণ শব্দ করে দোওয়া দরুদ পাঠ করেন।

মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করেন নাহারের জন্যে আর কাসেদের জন্যে।

বলেন, আমি মরে গেলে তোদের যে কি হবে ভেবে পাই না।

আজ বিকেলে কাসেদ বাসায় ফিরে এলে মা কাছে ডাকলেন ওকে।

বললেন, এখানে এসে বসো, আমার মাথার কাছে।

কপালে হাত রেখে কাসেদ দেখলো জ্বর আছে কিনা। নেই।

নাহার বললো, এই একটু আগে জ্বর নেমে গেছে।

মা বললেন, আমাকে নিয়ে তোরা ভাবিস নে। বুড়ো হয়ে গেছি, আর ক'দিন বাঁচবো।

কাসেদ বললো, ওসব অলক্ষুণে কথা কেন বলছো মা।, তুমি এখন ঘুমোও। এইতো কাল সকালেই ভাল হয়ে যাবে।

মা চুপ করলেন না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। তবু বললেন, তোর খালু এসেছিলো, নাহারের বিয়ের সেই পুরানো প্রস্তাবটা নিয়ে।

শ্বাস নেবার জন্যে থামলেন মা।

নাহার বিছানার ওপাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। বিয়ের কথা শুনে বারকয়েক ইতস্তত করে পাশের ঘরে সরে গেলো সে।

মা আবার বললেন, আমি এ বিয়েতে মত দিয়েছি। অসুখে যেমন ধরেছে কে জানে কখন মরে যাই। যাবার আগে ওকে স্বামীর ঘরে তুলে দিয়ে যেতে চাই। নইলে মরেও শান্তি পাবো না আমি। গলাটা ধরে এলো মায়ের। বার দু'য়েক ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, তাছাড়া ছেলেটাও তো খারাপ না, ভালোই, এখন তুই মত দিলেই হয়ে যায়।

মায়ের কথায় মৃদু হাত বুলোতে বুলোতে কাসেদ আস্তে করে বললো, আমার মতামতের কি আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে। অবশ্য নাহারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিয়ো।

ওকে আবার জিজ্ঞেস করবো কি? মা চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে।

আমরা কি ওর খারাপ চাই? ছেলেটা শুনেছি, দেখতে শুনতে ভালো।

মা পাশ ফিরে শুলেন।

কাসেদ নীরবে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

রাতে ওর ঘরে খাবার নিয়ে এলে নাহারকে বসতে বললো কাসেদ।

বললো তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

নাহার ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকালো ওর দিকে। বসলো না। দরজার কপাট ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কাসেদ ভাবলো কথাটা কিভাবে বলা যেতে পারে।

বিছানার ওপর থেকে উঠে টেবিলের পাশে গিয়ে বসলো সে।

নাহার অপেক্ষা করছে দাঁড়িয়ে।

থালার মধ্যে ভাত ঢেলে নিতে নিতে কাসেদ বললো, তোমার বিয়ের জন্যে খালু একটা প্রস্তাব এনেছেন শুনেছো–

নাহার কোন জবাব দিলো না।

কাসেদ ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে দেখলো তাকে।

তবু সে চুপ।

কাসেদ বললো, মা অবশ্য তাঁর মত দিয়েছেন। তুমি যদি মত দাও, তাহলে আমারও আপত্তির কিছু নেই।

নাহার নড়েচড়ে দাঁড়ালো।

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো দরজায়।

কাসেদ এবার আর তাকালো না।

নিঃশব্দে ভাত খেতে লাগলো সে। খেতে খেতেই বললো, তোমার ইচ্ছা হলে ছেলেটিকে দেখতেও পারো। আর যদি মত না থাকে তাও বলতে পারো। সঙ্কোচের কিছু নেই।

তবু চুপ করে রইলো নাহার। মুখখানা নুইয়ে পায়ের পাতার দিকে চেয়ে রইলো সে।

কি ব্যাপার, কিছু বলছো না যে?

নাহার নীরব।

তোমার কি কোন মতামত নেই?

তবু চুপ সে।

তুমি কি কিছুই বলবে না? কাসেদ স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে।

আমি কি বলবো? এতক্ষণে কথা বললো নাহার। ওর গলার স্বরে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা, আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করবেন, আমার কোন মতামত নেই। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো সে।

শেষের দিকে গলাটা জড়িয়ে এলো তার।

তখনো দাঁড়িয়ে সে।

হ্যারিকেনের আলোয় মুখখানা ভালো করে দেখা গেলো না।

পাশের ঘরে মা দরুদ পড়ছেন শুয়ে শুয়ে। এখান থেকে সব কিছু শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

ভাত খেয়ে উঠে দাঁড়াতে থালাবাসনগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেলো নাহার।

ও চলে যেতে খাতা-কলম নিয়ে বসলো কাসেদ।

লিখবে।

ভীষণ লিখতে ইচ্ছে করছে ওর।

অফিসের কানাগুষো ইদানীং অন্য রূপ নিয়েছে।

মকবুল সাহেবের প্রতি বড় সাহেবের পক্ষপাতিত্ব সবার মনে ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে। আর তাই রোজ অফিসে এসে কাজের ফাঁকে তারা চাপা সুরে এই অর্থপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলছে। রোজ বিকেলে সাহেব হাসপাতালে যান অসুস্থ মকবুল সাহেবকে দেখতে, তাঁর খবরাখবর নিতে।

কিন্তু কেন, কিসের জন্য?

শহরে এমন আরেকটি অফিস কি কেউ দেখাতে পারবে যার একজন কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়লে বড় সাহেব রোজ তাকে দেখতে যান? শুধু কি দেখতে যাওয়া?

রোজ যাবার সময় বিস্কিট, হরলিক্স, ফলমূল কত কিছু নিয়ে যান তিনি। তাছাড়া ওঁর পেছনে টাকা খরচ করার ব্যাপারেও এতটুকু কার্পণ্য করছেন না তিনি। শোনা যাচ্ছে কোলকাতা থেকে একজন নামকরা ডাক্তার আনার কথাও ভাবছেন বড় সাহেব।

কিন্তু কেন?

কাসেদ বলে, যদি টাকা খরচ করেই থাকেন, আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? শুনে বিশ্রীভাবে হাসে এক নম্বর কেরানী। বলে, মাথাব্যথা হতো না, যদি না এই টাকা খরচের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকানো থাকতো।

বলে আবার হাসে লোকটা।

কাসেদ বুঝতে পারে না, ও কি বলতে চায়। ইতস্তত করে আবার প্রশ্ন করে, তার মানে?

মানে? মানে অত্যন্ত সহজ। চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে এক নম্বর বলে, মকবুল সাহেবের একটি বয়স্কা মেয়ে আছে সে খবর রাখেন?

কাসেদ বলে, হ্যাঁ রাখি। একটি নয় দু-তিনটি মেয়ে আছে তাঁর।

ব্যাস। মাথা দুলিয়ে এক নম্বর কেরানী আবার বলে, বাকিটুকু আপনি নিজেই বুঝে নিন।

কাসেদের বুঝতে বাকি থাকে না।

একাউন্‌টেন্ট তার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বলেন, পরশু দিন বিকেলে দেখলাম বড় সাহেব তাঁর গাড়ি করে ওদের হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন।

কাসেদ পরক্ষণে বলে, ওটা অন্যায় কিছু করেন নি তিনি।

আরে সাহেব আপনার এত গা জ্বলছে কেন শুনি? এক নম্বর কেরানী টেনে টেনে বলেন, আমরা তো আর আপনাকে বলছি না।

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কাসেদ, বড় সাহেবকে এদিকে আসতে দেখে চুপ করে গেলো সে।

বড় সাহেব কেন যে এ ঘরে এলেন কিছু বুঝা গেল না।

লম্বা অফিস ঘরটায় বার কয়েক পায়চারী করলেন তিনি। মনে হলো কি যেন গভীরভাবে ভাবছেন, চিন্তা করছেন।

স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হবার আগে এবং পরে সব সময় তাঁকে কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট দেখাতো।

কিন্তু আজকের ভাবনার মধ্যে রয়েছে একটা অনিবার্য অস্থিরতা। কেরানীরা এখন আর কথা বলছে না।

কাজ করছে।

বিকেলে কাসেদের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেলো।

বাড়িতে মায়ের অসুখ। তবু বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করলো না তার।

ইচ্ছে হলো জাহানারাদের ওখানে যেতে।

কি করছে জাহানারা?

হয়তো বাগানে বসে বসে গল্প করছে পাড়ার বান্ধবীদের সঙ্গে।

কিম্বা তার শোবার ঘরে জানালার পাশে বই পড়ছে, উপন্যাস, গল্প অথবা কবিতা।

জাহানারা, এভাবে আর কতদিন চলবে বলতে পারো? কতদিন আমি ভেবেছি আমার মনের একান্ত গোপন কথাটা ব্যক্ত করবো তোমার কাছে। বলবো সব। বলবো এসো আমরা ঘর বাঁধি। তুমি আর আমি। আমরা দু'জনা, আর কেউ থাকবে না সেখানে।

কেউ না।

রাস্তায় কত লোক। আসছে। যাচ্ছে। কথা বলছে। ওরাও হয়ত ভাবছে কারো কথা। কারো স্বপ্ন আঁকছে মনে মনে, কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করছে ভবিষ্যতের দিনগুলোকে, রোমাঞ্চকর অনাগত দিন।

আজকাল জাহানারাকে নিয়ে একটু বেশি করে ভাবছে কাসেদ।

মূলে রয়েছে মা। রোজ একবার করে তাড়া দিচ্ছেন তিনি। বিয়ে কর। আমি বেঁচে থাকতে একটা বউ নিয়ে আয় ঘরে।

আর বিয়ের কথা যখনি ভাবে কাসেদ জাহানারা ছাড়া অন্য কারো চিন্তা মনে আসে না তার।

একমাত্র জাহানারা স্ত্রী হিসেবে ঘরে আসতে পারে তার।

আর কেউ নয়।

বাইরে, বাসার সামনে কমলা রঙের শাড়ি পরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, সে জাহানারা নয়, শিউলি।

শিউলির সঙ্গে সেই অনেকদিন আগে জাহানারার জন্মদিনে এই বাড়িতেই প্রথম আলাপ হয়েছিলো তার।

শিউলি হাসলো। জাহানারার কাছে এসেছেন বুঝি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

শিউলি বললো, ও এখন সেতার শিখছে, ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।

আসুন না, আমরা এখানে মাঠের ওপর বসি।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, হ্যাঁ বসা যেতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই।

শিউলি ঠোঁট টিপে হাসলো। মনে হলো কিছু বলবে। বললো না।

মাঠের ওপরে যেখানে কয়েকটা ফুলের টবে লাল, সাদা ফুল ফুটে আছে সেখানে এসে বসলো ওরা।

কাসেদ বললো, কই আপনি এলেন না তো একদিনও?

শিউলি বললো, যেতাম কিন্তু, পরে ভাবলাম আসা-যাওয়ার উৎসাহ দেখে আপনি যদি শেষে ভুল বুঝে বসেন আমায়?

ভুল! ভুল কিসের? কাসেদ অবাক হলো।

শিউলি হেসে হেসে বললো, যদি ভাবেন আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি তাহলে? বলে শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে সরু দেহটা যেন নেতিয়ে পড়তে চাইলো ঘাসের ওপরে।

কাঁধের ওপর থেকে কোলে নেমে আসা আঁচলখানা আবার যথাস্থানে তুলে দিয়ে শিউলি বললো, আচ্ছা একটা কথার জবাব দিতে পারেন?

কি কথা?

মাঝে মাঝে আপনাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে, কেন বলুন তো?

শিউলি তার চোখের দিকে তাকালো।

পর পর কয়েকটা ঢোক গিললো কাসেদ।

জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে পেলো না সে। আলোচনাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্যেই হয়তো সে পরক্ষণে বললো, চলুন না, জাহানারার ঘরে গিয়ে বসা যাক। এতক্ষণে তার সেতার শেখা নিশ্চয় শেষ হয়েছে। এত শিগ্‌গী? শিউলি যেন চীৎকার করে উঠলো। তারপর ঠোঁটের কোণে অর্থপূর্ণ হাসির ঈষৎ তরঙ্গ তুলে ধীর গলায় বললো, আপনি কি ভাবেন সেতার শেখানটাই মুখ্য?

কাসেদ শুধালো, কেন বলুন তো?

শিউলি হাসলো, আপনি কিছুই জানেন না তাহলে?

কাসেদের বুকটা কেঁপে উঠলো সহসা। কিছু বলতে গিয়ে আবার বার কয়েক ঢোক গিললো, কই জানি না তো?

শিউলির চোখেমুখে কৌতুক। সামনে ঝুঁকে এসে আস্তে বললো, তারের সঙ্গে তারের জোর প্রেম চলছে।

তার মানে? হৃৎপিণ্ডতা গলার কাছে এসে আঘাত করছে যেন। সপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কাসেদ।

শিউলি বললো, এখনো বুঝলেন না? ঠোঁট টিপে আবার হাসলো সে। এই সহজ কথা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে আপনার? চারপাশে এক পলক দেখে নিয়ে আরো কাছে সরে এলো শিউলি। মাস্টার আর ছাত্রীতে মন দেয়া নেয়ার পালা চলছে, বুঝলেন?

কাসেদের মনে হলো, ওর দেহটা যেন ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে আসতে চাইছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে না সে।

কেন এমন হলো জাহানারা?

এ সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে কি ক্ষতি হয়ে যেতো তোমার? আমি নিশ্চয় বাধা দিতাম না, কেন দেবো?

পৃথিবীতে আমরা সবাই প্রথমে নিজের কথা ভাবি, পরে অন্যের। তুমি তোমার পথে চলবে, আমি আমার পথে। তোমারটা আমি কোনদিনও কেড়ে নিতাম না। তবে কেন তুমি সব কিছু লুকিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে?

ওকি আপনি একেবারে চুপ করে গেলেন যে? শিউলির কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসার সুর, কি ভাবছেন?

না, কিছু না তো? কাসেদ নিজেকে আড়াল করতে চাইলো শিউলির দৃষ্টি থেকে।

শিউলি আবার বললো, আপনি যেন কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে?

তাই নাকি? না, এমনি। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

শিউলি শুধালো, উঠবেন নাকি?

কাসেদ বললো, হ্যাঁ, না ভাবছি–।

কি ভাবছেন?

এখানে আর একটু বসা যাক, কি বলেন? অনেকটা সহজ হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলি বললো, জাহানারার সঙ্গে দেখা করবেন না?

করবো না কেন? দেখা করতেই তো এসেছি। বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কাঁপলো ওর।

কি আশ্চর্য! আজ বিকেলে জাহানারাদের বাসার পথে আসতে আসতে অনেক কিছু ভেবেছে কাসেদ, অনেক কল্পনার জাল বুনেছে। কিন্তু ভুলেও ভাবে নি, মাস্টারের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে বসতে পারে জাহানারা। কেন এমন হলো?

শিউলি শুধালো, আপনার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে?

কাসেদ উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, শিউলি তাকে বাধা দিয়ে আবার বললো, ওই যে জাহানারা।

মাঠ থেকে বারান্দার দিকে দেখলো কাসেদ।

এইমাত্র মাস্টারকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে জাহানারা।

মাস্টার বললো, এবার যাই তাহলে?

জাহানারা বললো যাই নয়, আসি। কাল ঠিক সময় আসবেন তো? আসবেন কিন্তু।

নইলে আরো বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখবো। একটু শাসন, একটু রাগ, একটু অভিমান।

এমন করে তো কাসেদের সঙ্গে কথা বলে নি জাহানারা।

শিউলি বিড়বিড় করে কি বললো কিছু বোঝা গেল না।

জাহানারা তার মাস্টারের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

দাঁতগুলো চিকচিক করছে বিকেলের রোদে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ওরা।

শিউলি ডাকলো, জাহানারা।

ওদের দেখে চোখ জোড়া বড়ো বড়ো করে তাকালো জাহানারা, তোমরা ওখানে করছো কি?

শিউলি হেসে দিয়ে বললো, প্রেমালাপ করছি, তাই না কাসেদ সাহেব?

ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকা চোখে কাসেদের দিকে তাকালো সে।

জাহানারা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে সামনে।

কাসেদ কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো।

জাহানারা শুধালো, আপনি কখন এসেছেন?

কাসেদ কোন জবাব দেবার আগেই শিউলি বললো, অনেকক্ষণ হয় উনি এসেছেন, আমি আটকে রেখেছি এখানে।

জাহানারা বললো, ভিতরে গেলেই তো পারতেন।

না, ভাবলাম আপনার অসুবিধা হতে পারে। যতই লুকোতে ইচ্ছে করুক না কেন, গলার স্বর অস্বাভাবিক শুনালো জাহানারার কানে।

জাহানারা মিষ্টি হাসলো, কি যে বলেন, অসুবিধে কেন হবে! আসুন ভেতরে বসবেন।

কাসেদের মনে হলো জাহানারার কথাবার্তায় আগের সেই আন্তরিকতা নেই। বাড়িতে এসেছে যখন বসাতে হবে তাই বসতে বলছে সে। সামনে জাহানারা আর পেছনে শিউলি আর কাসেদ। পাশাপাশি। শিউলি চাপা স্বরে শুধালো, আপনার কি হয়েছে বলুন তো, সেই তখন থেকে কেমন যেন গুম হয়ে আছেন।

কাসেদ বললো, ও কিছু না।

জাহানারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কিছু বললেন কি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দেহটা কাঁপছে। বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা। যন্ত্রণা। কাসেদের মনে হলো এ মুহূর্তে এখান থেকে ছুটে দুরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে যেন কিছুটা শান্তি পেত সে। স্বস্তি পেতো। মাথাটা ভার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়িয়ে পড়তে চায় মাটিতে।

কেন এমন হলো?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জাহানারাকে দেখে নিলো কাসেদ। আজ ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয়। ওর চোখের আর মুখের লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। কথার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন।

কাসেদের মনে হলো সে যেন এ মুহূর্তে আরো বেশি করে ভালবেসে ফেলেছে ওকে। তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে ওর মনে।

না। জাহানারাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছুই কল্পনা করতে পারে না কাসেদ। কিছুই না।

জাহানারা শুধালো, চা খাবেন, না কফি?

কাসেদ কোন উত্তর দিলো না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

জাহানারা বললো, আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আজ কেমন যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে আপনাকে।

কাসেদ মনে মনে ভাবলো, পরিবর্তন আমার মধ্যে নয়, তোমার মধ্যে এসেছে। তুমি আগের সেই মেয়েটি নেই, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু মুখে বললো, আমার শরীরটা ভালো নেই।

সে কি, অসুখ করে নি তো? জাহানারার চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়াপাত হলো। হাত বাড়িয়ে ওর কপাল স্পর্শ করে দেখলো সে, বললো, কই টেম্পারেচার নেই তো?

শিউলি বললো, ওর তো জ্বর হয়নি যে টেম্পারেচার পাবে। ওর শরীর খারাপ করছে।

জাহানারা বললো, এক কাপ কফি খান, শরীর ভালো হয়ে যাবে।

কাসেদ বললো, থাক। এখন আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া এখনি আমাকে উঠতে হবে।

জাহানারা চোখ বড় বড় করে বললো, সেকি, এই এলেন আর চলে যাবেন?

কথাটা কানে গেলো না ওর। ও তখন ভাবছে জাহানারার জন্যে একটা সেতারের মাস্টার ঠিক না করে দিয়ে কত বড় ভুল করেছে। জাহানারা বারবার করে বলেছিলো, একটা মাস্টার ঠিক করে দিন। তখন যদি ওর অনুরোধ রক্ষা করতো সে তাহলে হয়তো এত বড় বিপর্যয় ঘটতো না।

শিউলি শুধালো, আপনি কি বাসায় ফিরবেন?

কাসেদ বললো, হ্যাঁ।

খুলে যাওয়া খোঁপাটা ভালো করে বাঁধতে বাঁধতে জাহানারা জানালার পাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর সেখান থেকে জিজ্ঞেস করলো, রোববার দিন বিকেলে কি আপনি বাসায় থাকবেন?

কেন?

যদি থাকেন তাহলে বাসায় আসবো। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। বুকটা আবার মোচড় দিয়ে উঠলো ওর। আড়চোখে একবার ওকে দেখে নিয়ে বললো, রোববার ছাড়া অন্য কোন দিন আসতে পারেন না?

জাহানারা বললো, রোববার দিন আমার ছুটি কিনা তাই। অন্যদিন গেলে আমার সেতার শেখা হবে না। মাস্টার ভীষণ রাগ করবেন।

আবার সেতার শেখা!

আবার সেতারের মাস্টার!

রাগে দেহটা জ্বালা করে উঠলো ওর। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি বাসায় থাকবো, আসবেন। এখন চলি।

ওর সঙ্গে শিউলিও উঠে দাঁড়ালো। আমার একটা কথা রাখবেন কাসেদ সাহেব?

কি?

বাড়ি যাবার পথে আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন?

কিন্তু.....কাসেদ ইতস্তত করে বললো, পথটা তো এক হলো না।

উল্টো।

শিউলি বললো, আমার জন্যে না হয় একটু উল্টো পথ ঘুরেই গেলেন। যাবেন কি?

কাসেদ জাহানারার দিকে এক পলক তাকালো। ও জানালা গলিয়ে বাইরে আকাশ দেখছে, দেখুন।

কাসেদ বললো, যাবো বইকি, চলুন। গলার স্বরে উৎসাহের আধিক্য দেখে নিজেই চমকে উঠলো। বুঝতে পারলো না কথাটা হঠাৎ এত জোরের সঙ্গে কেন বলতে গেলো সে।

জানালা থেকে সরে এলো জাহানারা।

শিউলি শুধালো, তুমি এখন ঘরে বসে বসে করবে কি জাহানারা?

জাহানারা ধীর গলায় বললো, কি আর করবো, মাস্টার একটা নতুন গদ দিয়ে গেছেন, বসে বসে সেতার বাজাবো।

আবার মাস্টার!

আবার সেতার!

শিউলিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো কাসেদ।

কিছুই ভালো লাগছে না।

মনটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে ওর।

আকাশে অনেক তারা জ্বলছে। রাস্তায় অনেক লোক। বাতাসে কার বাগানের মিষ্টি গন্ধ আসছে ভেসে। কিন্তু এর কোন কিছু দিয়ে এ শূন্যতা ভরানো যাবে না।

শুনেছেন? সহসা কাসেদ বললো, আপনার প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। আপনি আমার একটা কথা রাখুন আজ।

কি কথা? শিউলির দুচোখে ঔৎসুক্য ভীড় করেছে এসে।

কাসেদ মৃদু গলায় বললো, আমার সঙ্গে একটু বেড়াবেন। ঘুরবেন যেখানে যেখানে আমি নিয়ে যাই। আজ বড় একা লাগছে আমার।

শিউলি ভ্রূজোড়া প্রসারিত করে তাকালো ওর দিকে, তারপর হেসে বললো, কিন্তু আমাকে যে ন'টার মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে হবে, নইলে সুপার ভেতরে ঢুকতে দেবে না। শেষে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে।

কাসেদ ম্লান হেসে বললো, আমি যদি আপনার জন্যে উল্টো পথে পাড়ি দিতে পারি, আপনি আমার জন্য এ ঝামেলার ঝুঁকিটা নিতে পারেন না? কিন্তু কেন বলুন তো? কণ্ঠে ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে শিউলি শুধালো, আজ হঠাৎ বেড়াতে ইচ্ছে হলো কেন আপনার? বিশেষ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

কাসেদ সহসা জবাব দিলো না।

নীরবে কি যেন ভাবলো।

জাহানারা, কেন এমন করলে তুমি!

তোমাকে ভালবেসে পরিপূর্ণ ছিলাম আমি। যেদিকে তাকাতাম ভালো লাগতো আমার। আজ আকাশের নীল আর নিওনের আলো সব কিছু বিবর্ণ মনে হচ্ছে আমার চোখে।

কেন এমন হলো জাহানারা?

আমি জাহানারা নই, শিউলি। শিউলি মিটিমিটি হাসছে। কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে ওর।

কাসেদ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, না– মানে। কথাটা শেষ করলো না সে। সহসা শিউলির একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবেগভরা গলায় কাসেদ বললো, আচ্ছা বলতে পারেন, আমি যা চাই তা পাইনে কেন?

হাতখানা সরিয়ে নিলো না শিউলি। মৃদু চাপ দিয়ে শুধু বললো, চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে-নেউলের সম্পর্ক রয়েছে যে। এই দেখুন না, আমি চাই ছেলেদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশতে আর ওরা চায় আমাকে ঘরের গিন্নী হিসেবে পেতে। ভাবুন তো কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার। শিউলি হাসল শব্দ করে। কিন্তু আপনাকে যদি কেউ গিন্নী হিসেবে পেতে চায়, সেটা কি অন্যায়?

ওর হাতে একটা নাড়া দিলো শিউলি।

শিউলি পরক্ষণে বললো, একতরফা চাওয়াটা অন্যায় বইকি।

কথাটা তীরের ফলার মত এসে বিধঁল ওর বুকে।

শিউলি কি বলতে চায় জাহানারার সঙ্গে একতরফা প্রেম করে অন্যায় করেছে কাসেদ? না। আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি। কাসেদ জোরের সঙ্গে বললো, ভালবাসা অন্যায় নয়। সে একতরফা হোক কিম্বা দু'তরফা । হাতখানা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে শিউলি অপূর্ব কণ্ঠে বললো, ধরুন আমি যদি আপনাকে ভালবাসি। আপনি কি তা সহজ করে নিতে পারেন? অবশ্য, আপনাকে ভালবাসতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসছে না।

কেন, কেন বলুন তো ; শিউলির কথার জবাব দিতে গিয়ে বিচলিত বোধ করলো কাসেদ। সে বুঝে উঠতে পারলো না আর পাঁচটি ছেলেকে যদি ভালবাসা যেতে পারে, ওকে কেন নয়।

শিউলি কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর বললো, এসব কেনর উত্তর দেয়া কঠিন কাসেদ সাহেব। আমার তরফ থেকে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, আপনি বন্ধু হিসেবে অত্যন্ত ভালো, কিন্তু প্রেমিক হিসেবে নন। বলে মুখ টিপে হাসলো সে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো কাসেদের।

হাত-পাগুলো ভেঙ্গে আসছে।

না, আমি তো বন্ধু হিসেবে জাহানারাকে পেতে চাইনে।

আমি চাই আরো আপন করে।

একান্তভাবে নিজের করে।

কেন, কেন আমাকে ভালবাসা যেতে পারে না? আবেগের চাপে গলাটা ভেঙ্গে আসছে তার। আপনি কি মনে করেন– কথাটা শেষ করতে পারলো না কাসেদ। শিউলির হাসির শব্দে থেমে গেলো। শিউলি বললো, আপনার কি যেন হয়েছে আজ। এসব বাদ দিয়ে এখন বাসায় ফিরে যান। আমারও হোস্টেলে যেতে হবে।

কাসেদ কোন জবাব দেবার আগেই রিক্সাওয়ালাকে হোস্টেলের পথে যাবার নির্দেশ দিলো শিউলি।

পথে আর কোন কথা হলো না।

শিউলি চুপ। ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি হাসি। মাঝে মাঝে জেগে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

কাসেদ নীরব। মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে ওর।

সারা রাত ঘুমালো না সে।

সকালে স্নান সেরে বড় সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখলো কাসেদ। দিন সাতেকের ছুটি চাই।

এ সাত দিন কোথাও বেরুবে না সে।

একা ঘরে বসে থাকবে। শুধু ভাববে আর ভাববে।

কেন এমন হলো?

আগামী রোববার বাসায় আসবে বলেছে জাহানারা। কেন আসবে? কিছু কথা আছে তার। কি কথা?

একবার ডেকেছিল সেতারের মাস্টার ঠিক করে দেবার জন্য।

এবার হয়তো বলবে, মাস্টারের সঙ্গে আমার বিয়ের আয়োজন করে দাও।

কাসেদ যেন এ জন্যেই এসেছিলো জাহানারার জীবনে।

দরখাস্তখানা লিখে পকেটে রাখলো কাসেদ।

সাত দিনের ছুটি চাই তার। যদি না দেয় তাহলে, ও চাকরিই ছেড়ে দেবে সে। কি হবে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত গাঁধার খাটুনি খেটে?

তারচে' লিখবে সে। দিন রাত শুধু লিখবে আর লিখবে।

সেই ভালো।

দরখাস্ত নিয়ে অফিসে এসে, খবর শুনে বোবা হয়ে গেলো কাসেদ। বড় সাহেব আবার বিয়ে করছেন। বিয়ে করছেন মকবুল সাহেবের মেজো মেয়েকে।

আগেই জানতাম, এ না হয়ে পারে না। এক নম্বর কেরানী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন, বলি নি আমি, এতো যে ছুটোছুটি এর পিছনে কিন্তু আছে, দেখলেন তো?

একাউন্‌টেন্ট বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। বলে একটা লম্বা হাই তুললেন তিনি, কিন্তু কি বলেন, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না? দুনিয়াতে কতো মেয়ে থাকতে কিনা ওই কালো কুৎসিত মেয়েটাকে– কথাটা শেষ করলেন না তিনি। অঙ্গভঙ্গী দিয়েই বাকিটুকু বুঝিয়ে দিলেন।

এক নম্বর কেরানী হাসলেন কাসেদের দিকে তাকিয়ে।

কাসেদ নিজের খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সেই সেদিন মকবুল সাহেবের বাড়িতে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় আবিষ্কার করা মেয়েটি এখন গিন্নি সেজে বড় সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছেন ঘর-সংসার করার জন্য। ইচ্ছে করলে কাসেদও বিয়ে করতে পারতো।

তাহলে এখন বড় সাহেবের ঘরে না থেকে মেয়েটি থাকতো কাসেদের ঘরে। অফিস শেষে বাড়ি ফিরে গেলে ছুটে এসে দরজা খুলে দিত সে। হেসে বলতো, ফিরতে এতো দেরি হলো যে?

কাসেদ গম্ভীর গলায় বলতো, একগাধা কাগজ ফেলে আসি কি করে বল তো?

বলতে বলতে এক হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিতো সে আর অন্য হাতে কাছে টেনে নিতো তাকে।

কিন্তু এসব কি চিন্তা করে কাসেদ?

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, বেয়ারার হাতে দরখাস্তখানা বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলো কাসেদ।

একটু পরে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

কাসেদ ভাবছিলো, কি বলে ছুটি নেবে।

কিন্তু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভাবনা মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো সে।

কোট-প্যান্ট নয় আজ পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে অফিসে এসেছেন তিনি। সারা মুখে পরিতৃপ্তির উজ্জ্বল আভা। দু'চোখে আনন্দের অপূর্ব ঝিলিক। যেন জীবনে এ প্রথম প্রেমে পড়েছেন বড় সাহেব। তার এ রূপ আর কখনো দেখে নি কেউ।

সাহেব মৃদু গলায় শুধোলেন, হঠাৎ ছুটি চাইছেন, কি ব্যাপার?

কাসেদ বললো, মায়ের ভীষণ অসুখ। সারাক্ষণ তার কাছে থাকতে হচ্ছে, তাই। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। সাহেব উৎকণ্ঠা জানিয়ে বললেন ভীষণ অসুখ, সেকি? ভালো দেখে ডাক্তার দেখিয়েছেন তো?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো কাসেদ, বললো, ডাক্তার বলেছে সব সময় রোগীর কাছে কাছে থাকতে, তাইতো– কথাটা শেষ করলো না সে।

টেবিলের ওপর থেকে কলমটা তুলে নিয়ে দরখাস্তের একপাশে কি যেন লিখলেন বড় সাহেব। বললেন ছুটি আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এর মধ্যে মায়ের শরীর যদি ভালো হয়ে আসে, তাহলে অফিস করবেন এসে। নইলে অনেক কাজ জমা হয়ে পড়ে থাকবে।

দরখাস্তখানা টেবিলের এক পাশে রেখে দিয়ে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল টিপলেন বড় সাহেব। তাকে সালাম জানিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো কাসেদ।

রোববার দিন আসবে বলেছিলো জাহানারা।

এলো না।

সকাল থেকে বাসায় অপেক্ষা করেছে কাসেদ। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, দুপুর পেরিয়ে বিকেল, তখনো না আসায় বিচলিত বোধ করলো সে। একবার মনে হলো, হয়তো সে আর আসবে না, কাপড় পরে বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করলো। কিন্তু কাপড় পরা হয়ে গেলে মনে হলো যদি সন্ধ্যার পরে আসে সে, তাহলে? কাসেদকে ঘরে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে জাহানারা। কে জানে, কি কথা বলার আছে তার– এমনো হতে পারে শিউলি যা বলেছে তার সবটুকু মিথ্যা। হায় খোদা, যদি তাই হতো।

ভাবতে গিয়ে আর বাইরে বেরুনো হয় না তার।

কিন্তু সন্ধ্যার পরেও এলো না জাহানারা। রাতেও না।

বিরক্ত হয়ে রাত দশটার পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কাসেদ।

ফিরেছে রাত দুটো বাজিয়ে।

সে রোববার না এলেও পরের রোববারে এলো জাহানারা।

তখন বিকেল।

ঘরে এসে মায়ের মাথার কাছে বসলো সে।

অসুস্থ মা অনুযোগভরা কণ্ঠে বললেন, এতদিন পরে এলে মা।

জাহানারা মৃদু গলায় বললো, কাজ ছিলো।

কাজ ছিলো না হাতি ছিলো। অদূরে দাঁড়ানো কাসেদ আনমনে বিড়বিড় করে উঠলো।

মা অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখছিলেন তাকে। আর ফিরে তাকাচ্ছিলেন কাসেদের দিকে।

মা কি চান আর এ মুহূর্তে তিনি মনে মনে কি ভাবছেন তা ভালো করে জানে কাসেদ।

যাঁরা ধর্মপ্রাণ, খোদা নাকি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন, তবে কি মায়ের বাসনা বাস্তবে রূপ পাবে?

কাসেদ কি বিয়ে করতে পারবে জাহানারাকে?

ওহ! এসব কি ভাবছে সে।

মা আর জাহানারার সামনে থেকে সরে নিজের ঘরে চলে এলো কাসেদ। একটা বিষয় সে এখনো বুঝতে পারছে না। আজ আসার পরে থেকে কাসেদের সঙ্গে এখনো একটা কথাও বলে নি জাহানারা। বললে নিশ্চয় ওর সম্মান হানি হতো না।

সেতারের মাস্টারকে যদি ও বিয়ে করতে চায় করুক না, তাতে কাসেদের কোন বক্তব্য থাকবে না। ব্যথা যদি সহ্য করতে হয় নীরবে সহ্য করবে সে। পাশের ঘরে মা আর জাহানারা কি আলাপ করছে, সব এ ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছে কাসেদ।

মা এখন নাহারের বিয়ের কথা শোনাচ্ছে তাকে।

ওর বিয়ের পাকা কথা দিয়ে দিলাম মা। দিন তারিখ আসছে হপ্তায় ঠিক হবে। ছেলেটি বড় ভালো।

জাহানারা শুধালো, ছেলে কি ঢাকাতেই আছে?

মা বললেন, হ্যাঁ। ঢাকায় বাসা আছে ওর।

জাহানারা বললো, তাহলে ভালোই হলো, সব সময় আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

তা মা আমি যত দিন বেঁচে আছি ওকে চোখের আড়াল করছি নে। বিয়ের পরেও ও আমার কাছে থাকবে। মা ভাঙ্গা গলায় বলছেন, ও আমার ডান হাত। ও কাছে না থাকলে আমি চোখে দেখিনে মা। বড় ভালো মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে। অমনটি আর হয় না। বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কিন্তু থামলেন না। আবার বললেন, মেয়েদের পাঁচ দশটা স্বাদ আহলাদ থাকে। ওর তাও নেই। কোনদিন মুখ ফুটে কিছুই চায় নি সে আমার কাছে। বলতে গিয়ে একবার কেঁদে ফেললেন তিনি। কান্নায় বন্ধ হয়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

নাহার ডাকলো, মা।

জাহানারা নীরব। কি বলবে হয়তো সে বুঝে উঠতে পাচ্ছিলো না। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে মা বললেন, যাও, তুমি এবার ও ঘরে গিয়ে বসো। নাহার, মা আমার ওদের জন্যে দু'কাপ চা বানিয়ে দে। কাসেদ বিছানায় বসে বসে এতক্ষণ ওদের আলাপ শুনছিলো।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে সরে গেলো সে।

দরজার দিকে পেছন ফিরে থাকায় সেদিককার কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে বাইরের আকাশ। যদিও সজাগ মন তার পেছনেই পড়ে আছে। জাহানারার পায়ের শব্দ শোনা গেলো এ ঘরে।

জানালার ওপর আরো ঝুঁকে এলো সে।

শব্দ থেমে গেছে।

কাসেদ আড়চোখে একবার তাকালো পেছনে।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে জাহানারা। দেখছে ওকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। কাসেদ। ও, আপনি!

ও কখন এসেছে যেন জানে না সে।

জাহানারা মৃদু গলায় শুধালো, অমন তন্ময় হয়ে কি দেখছিলেন বাইরে?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। সরে এসে বিছানায় বসলো কাসেদ, বসুন। চেয়ারটা টেনে জাহানারা বসলো। গত রোববার দিন আসবো বলেছিলাম। হঠাৎ একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারি নি।

যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে সে।

কাসেদ বললো, অবশ্য আমিও বাসায় ছিলাম না। একটা কাজে সারাদিন বাইরে থাকতে হয়েছিলো। মিথ্যে কথাই বললো সে, কেন যে বললো হঠাৎ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিজেও খুঁজে পেলো না।

জাহানারা হেসে বললো, তাহলে না এসে ভালোই করেছি। কি বলেন?

কাসেদ হাসতে চেষ্টা করলো, পারলো না। টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগলো জাহানারা। কিছু বলবে সে। কিন্তু, কোত্থেকে যে শুরু করবে তাই ভেবে উঠতে পারছে না। বার দুয়েক ব্যর্থ হয়ে অবশেষ জাহানারা বললো, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।

কাসেদ ঢোক গিলে বললো, বলুন।

বুকটা আবার অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে তার। হাত-পাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

বইটা বন্ধ করে জাহানারা বললো, আপনি হয়তো জানেন না যে শিউলি একটি ছেলেকে ভালবাসতো।

না, নাতো। কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো জাহানারার দিকে। সে বুঝতে পারলো না জাহানারা হঠাৎ শিউলির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে কেন। স্বল্প বিরতি নিয়ে জাহানারা আবার বললো, ছেলেটি এখন ইটালিতে আছে। ফাইন আর্টসের ছাত্র সে।

কিন্তু– কিছু বলতে গেলো কাসেদ।

ওকে থামিয়ে দিয়ে জাহানারা আবার বললো, দু'বছরের ট্রেনিং-এ গেছে সে। ফিরে এসে ওদের বিয়ে হবে।

কিন্তু সেতো কোনদিন বলে নি আমায়। ঈষৎ বিস্মিত স্বরে কাসেদ বললো। আজ আপনার কাছ থেকেই প্রথম শুনছি।

জাহানারা স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর টেনে টেনে বললো, আপনি জানেন না বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। নইলে– সে থেমে গেলো হঠাৎ।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, কিন্তু এসব আপনি কেন বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি অবুঝ নন। জাহানারা পরক্ষণে বললো, কাউকে ভালবাসতে যাওয়ার আগে তার সব কিছু জেনে নেয়া উচিত, নইলে পরের দিকে অশেষ অনুতাপে ভুগতে হয়। বলতে গিয়ে চোখেমুখে রক্ত এসে জমেছে তার। কথাগুলো জড়িয়ে আসতে চাইছে বারবার।

কাসেদ চমকে উঠলো।

কিছু বলতে যাবে এমন সময় চা হাতে নাহার এসে ঢুকলো ঘরে।

দু'জনের দিকে দু'কাপ চা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে উভয়ের দিকে তাকালো নাহার। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো সে।

টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জাহানারা আবার বললো, অবশ্য শিউলি মেয়ে হিসেবে খারাপ নয়। আমার কাজিন। আমি ওকে ভালো করে জানি।

তাছাড়া আপনার সঙ্গেও মানাবে বেশ। কিন্তু কথাটা শেষ করলো না সে।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, কি ভেবে আবার বসে পড়লো কাসেদ। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুধালো, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

জাহানারা কথার জবাবে বললো, আমার অনধিকার চর্চার জন্যে হয়তো আপনি রাগ করেছেন। তাই ক্ষমা চাইছি।

কাসেদ বললো, ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কথা কি জানেন, আপনি যে এই এতক্ষণ এত কিছু বললেন আমি তার কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছি না। শিউলিকে আমি ভালবাসি এ কথা আপনাকে কে বললো শুনি?

ভয় নেই। জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আমি নিশ্চয় এ নিয়ে দশ জায়গায় আলোচনা করবো না।

কাসেদ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আপনি ভুল করছেন। শিউলির সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস করুন।

সহসা গম্ভীর হয়ে গেল জাহানারা। স্থিরচক্ষে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করলো ওর দু'চোখের মণিতে। তারপর টেনে টেনে বললো, সেদিন বাসা থেকে ফিরে আসার পথে আপনি কি কিছু বলেন নি ওকে?

কাসেদ ভাবতে চেষ্টা করলো।

সেদিন অনেক কথা হয়েছে শিউলির সঙ্গে। অনেক আলাপ। সঠিক সব কিছু ভাবতে গিয়েও মনে হলো না তার।

ওকে চুপ থাকতে দেখে জাহানারা মৃদু হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেক রাত হয়ে গেলো, এখন উঠি তাহলে।

কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে বললো, একটা ভুল ধারণা নিয়ে আপনি চলে যাবেন? বসুন।

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

জাহানারা বসলো। বসে বললো, বলুন কি কথা।

পাশের ঘরে মা নামাজ শেষে টেনে টেনে সুর করে কোরান শরীফ পড়ছেন। শরীরটা আজ একটু ভালো যাচ্ছে তাঁর। তাই উঠে বসেছেন বিছানায়।

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মেঝের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সেদিন ওর সঙ্গে আমার তেমন কোন কথা হয়নি। যা হয়েছিল তার সবটুকু আমার মনে নেই। তবে যে কথাই হোক না কেন, তা থেকে আপনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা– সত্যি বলতে কি হাসি পাওয়ার মতো।

জাহানারা মৃদু হাসলো। আপনার কাছে কৈফিয়ত চাই নি কাসেদ সাহেব।

আমি কৈফিয়ত দিচ্ছিও না। সহসা রেগে গেলো কাসেদ। আপনি শুনতে চেয়েছিলেন তাই বলছিলাম। না করলে বলবো না। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে সরে গেলো সে।

দু'জনে নীরব।

পাশের ঘর থেকে শুধু মায়ের সুর করে কোরান পড়ার শব্দ আসছে ভেসে। ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে বাইরে।

আকাশে অনেক তারা।

এবার চলি। পেছন থেকে জাহানারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কাসেদ। ফিরে তাকালো না।

বললো, আসুন।

ঘরের মাঝখান থেকে জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেলো। পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে জাহানারা।

কাসেদ তখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে।

মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার পরিণাম অবশেষে এই দাঁড়ায়। জাহানারার মাধ্যমে আলাপ হয়েছিলো। তারপর দেখা হলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতো। আলোচনা করতো। এর উর্ধ্বে অন্য কোন সম্পর্ক ছিলো না।

কে জানে হয়তো এটা জাহানারার একটা মনগড়া ব্যাপার। নিজে থেকে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত টেনেছে সে। আর তাই নিয়ে ছুটে এসেছে কাসেদকে বলতে। বলতে নয় ঠিক, বকতে। কিন্তু কেন?

কাসেদ যদি শিউলিকে সত্যি ভালবেসে থাকে তাতে জাহানারার এত মাথাব্যথ্যা কেন। ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন একটু আলোর সন্ধান পেলো কাসেদ।

জাহানারা ভালবাসে ওকে।

শিউলি যা বলেছে সব মিথ্যে।

এতো অস্থিরতার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মনটা ভালো হয়ে গেলো ওর। বেশ হাল্কা বোধ করলো সে।

কাল বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে জাহানারাদের বাসায় যেতে হবে তাকে। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে সব। তুমি যা ভেবেছো তার সবটুকু মিথ্যে জাহানারা। শিউলির সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। যদি কিছু থেকে থাকে সেতো তোমার সঙ্গে।

আমি তোমাকে ভালবাসি জাহানারা।

না। তা হয় না। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।

জাহানারা অটল।

না জাহানারা। একবার চেয়ে দেখো তোমাকে ভালবেসে আমি যে নিঃশেষ হয়ে গেলাম।

আমি একটি মেয়ে, ক'জনকে ভালবাসবো বলুন তো? জাহানারার চোখে মুখে কৌতুক।

শুধু আমাকে। শুধু আমাকে জাহানারা। কাসেদের গলার স্বর কাঁপছে। বুকের নিচে যন্ত্রণা।

বাইরে কাক ডাকছে। বোধ হয় ভোর হয়ে এলো।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো কাসেদ।

চোখজোড়া জ্বালা করছে।

মাথা ঘুরছে।

সারা দেহে ঘাম ঝরছে ওর।

মা আর নাহার চাপাস্বরে কথা বলছে পাশের ঘরে।

ভোর হবার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে ওরা। সাংসারিক আলাপ আলোচনাগুলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ সময়ে সেরে নেয়।

কলতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জল ঢাললো কাসেদ।

মাথা তুলতে দেখে, নাহার তোয়ালে হাতে পেছনে দাঁড়িয়ে।

হাত বাড়িয়ে তোয়ালেখানা ওকে দিলো নাহার। আস্তে করে বললো, সাবান এনে দেবো?

তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে কাসেদ বললো, না।

নাহার আর দাঁড়ালো না, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি চলে গেলো সে।

ঘরে এলে মা শুধালেন, কিরে আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, এমনি।

বেলা ন'টার সময় অফিসে যাবার জন্যে বেরুচ্ছে, মা কাছে ডাকলেন, পাশে বসিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলালেন ওর। বললেন, আজ একটু তাড়তাড়ি বাসায় ফিরে আসবি বাবা, আমার কেমন যেন লাগছে।

কাসেদ বললো, ভেবো না মা, তুমি খুব শিগ্রী ভালো হয়ে যাবে।

মা ম্লান হাসলেন।

বাসা থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ এসেছে, একখানা রিক্সা এসে থামলো সামনে।

শিউলি বসে, মিটিমিটি হাসছে সে।

মুহূর্তে বিগত বিকেলের কথা মনে পড়ে গেলো কাসেদের।

বাহ্, বেশ তো! রিক্সা থেকে দ্রুত নেমে এসে শিউলি বললো, আমি এলাম বাসায় আর আপনি চলে যাচ্ছেন?

আপনার কোন বাঁধন নেই, আমাকে অফিসে চাকুরি করে খেতে হয়। –যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলি বললো, সে আমি জানি। আর এও জানি আপনি একজন অনুগত কেরানী। কাজ ফেলে বসে থাকেন না। মিষ্টি করে কথাটা বললো সে, বলে হেসে উঠলো তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে।

কাসেদ তেমনি গম্ভীর স্বরে বললো, বাসায় মা আছেন, নাহার আছে, যান না, ওদের সঙ্গে গল্প করে বেশ কিছুটা সময় কাটবে আপনার। আমি ওদের কাছে আসি নি তা আপনি জানেন, শিউলির কণ্ঠস্বর সহসা পাল্টে গেলো।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তাহলে কার কাছে এসেছেন?

তাও আমাকে বলতে হবে? ভ্রূজোড়া বিস্তারিত করে অপূর্ব ভঙ্গীতে হাসলো শিউলি, তাহলে শুনুন, আমি আপনার কাছে এসেছি এবং আপনার কাছেই আসি।

কিন্তু কেন? উত্তেজিত গলায় কাসেদ শুধালো, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই যার জন্যে আপনি আমার কাছে আসতে পারেন। সারা মুখ কালো হয়ে গেলো শিউলির।

ঠোঁটের কোণে একসূতো হাসি জেগে উঠলো ধীরে ধীরে, তারপর সে হাসি অতি সুক্ষ্ম ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়লো তার সম্পূর্ণ ঠোঁটে, চিবুকে, চোখে, সারা মুখে।

শিউলি মৃদু গলায় বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া না করে, আসুন রিক্সায় উঠুন। ভয় নেই আপনাকে নিয়ে আমি কোথাও পালিয়ে যাবো না, অফিসে নামিয়ে দিয়ে আমার হোস্টেলে ফিরে যাবো।

কাসেদ বললো, আমি রোজ হেঁটে যাই, আজও যেতে পারবো।

শিউলি বললো, দেখুন মেয়েমানুষের মত রাগ করবেন না, উঠুন, রিক্সায় উঠুন। শিউলির চোখের দিকে তাকিয়ে এবার আর না করতে পারলো না কাসেদ, নীরবে উঠে বসলো সে।

রিক্সাওয়ালাকে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে শিউলিও উঠে বসলো পাশে। আজ একটু ছোট হয়ে বসতে চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলির গায়ে গা লাগতে পারে সেই ভয়ে।

শিউলি আড়চোখে এক পলক দেখে নিয়ে মৃদু হাসলো। হেসে বললো, আপনারা পুরুষ মানুষগুলো এত সহজে বদলে যেতে পারেন যে কি বলবো!

কাসেদ চুপ করে থাকবে ভেবেছিলো, কিন্তু জবাব না দিয়ে পারলো না। অন্য পুরুষের কথা আমি বলতে পারবো না। নিজে আমি সহসা বদলাই নে। আমি যা ছিলাম তাই আছি, তাই থাকবো।

তাই নাকি? চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো শিউলি। শুনে বড় খুশি হলাম। কিন্তু জনাব, একটা কথা যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে রাগ করবেন না তো? মুখ টিপে হাসছে শিউলি।

কাসেদ বললো, বলুন।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে শিউলি ধীরে ধীরে বললো, সেদিন বিকেলে সেই একসঙ্গে রিক্সায় চড়ে হাতে হাত রেখে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে একটা কি দুটো কথা বলা এর সবটুকুই কি মিথ্যা। মুখখানা নুইয়ে ওর চোখে চোখে তাকাতে চেষ্টা করলো শিউলি।

সহসা কোন উত্তর দিতে পারলো না সে।

একটু পরে কি ভেবে বললো, আপনি যা ভাবছেন সে অর্থে মিথ্যে।

আমি কি ভেবেছি তা আপনি বুঝলেন কি করে?

কারণ আমি শুনেছি সব। কাসেদ বিরক্তির সঙ্গে বললো : জাহানারা এসেছিলো বাসায়, কাল বিকেলে।

শিউলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলো সে।

রিক্সাটা কাসেদের অফিসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

শিউলি আস্তে করে বললো, সেদিন আপনি একটা অনুরোধ করেছিলেন, আমি রেখেছিলাম। আজ আমার একটা কথা আপনি রাখবেন? ওর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য আবেগ।

নড়েচড়ে বসে কাসেদ শুধালো, কি কথা বলুন?

শিউলি ধীর গলায় বললো, আজ বিকেলে আমি নিউ মার্কেটের মোড়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, আপনি আসবেন, কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। আসবেন তো?

রিক্সা থেকে নেমে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ।

তারপর মৃদুস্বরে বললো, চেষ্টা করবো।

চেষ্টা করবো নয়, অবশ্যই আসবেন।

ততক্ষণে অফিসের দোড়গোড়ায় পা দিয়েছে কাসেদ।

শিউলি রিক্সা নিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে রইলো, না চলে গেলো, একবার ফিরেও দেখলো না সে।

অফিসে এখন আর সে উত্তেজনা নেই।

সব শান্ত।

মকবুল সাহেব পক্ষাঘাত রোগে এখনও বিছানায় পড়ে আছেন। ভালো হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পরস্পরের কাছ থেকে শোনা যায় আজকাল আর আগের সে আর্থিক অনটন নেই তাঁর। বড় সাহেবের শ্বশুর এখন, বেশ সুখেই আছেন। বড় সাহেবও বেশ সুখী।

রোজ দুপুরে মকবুল সাহেবের মেয়ে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে তাঁর জন্যে। পরনে সুন্দর একখানা শাড়ি, মাথায় ছোট একটা ঘোমটা, হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার, পায়ে পাতলা স্যাণ্ডেল। নিঃশব্দে মেয়েটি উঠে আসে ওপরে। হাল্কা পায়ে সে এগিয়ে যায় বড় সাহেবের কামরার দিকে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে খায়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নীরবে আবার বাড়ি ফিরে যায় মেয়েটি।

প্রথম প্রথম অফিসের সবাই মুখ টিপে হাসতো। চাপা স্বরে আলোচনা চলতো ওদের নিয়ে।

আজকাল তাও বন্ধ।

শুধু মেয়েটি যখন আসে আর সামনে দিয়ে হেঁটে বড় সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় তখন কি একটা অস্বস্তিতে ভোগে কাসেদ।

ইচ্ছে করে মেয়েটিকে দেখতে।

কিন্তু ও যখন আসে তখন ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েও পারে না সে। কোথা থেকে একটা জড়তা এসে সারা দেহ গ্রাস করে নেয় ওর। মেয়েটি ওর বউ হতে পারতো।

ইচ্ছে করলে ওকে বিয়ে করতে পারতো কাসেদ।

হয়তো ওকে নিয়ে বেশ সুখী হতে পারতো সে। আজ বড় সাহেবের জন্যে খাবার নিয়ে আসে, সেদিন কাসেদের জন্যে আসতো মেয়েটি।

দু'জনে এক সঙ্গে খেতো ওরা।

কথা বলতো।

গল্প করতো।

কত না আলাপ করতো খেতে বসে।

কিন্তু জাহানারা।

জাহানারা, একি করলে তুমি?

অফিসের কাজ করতে বসে একটুও মন বসল না ওর। গতদিন বিকেলের ছবিটা বার বার ভেসে উঠছে চোখে। জাহানারার প্রতিটি কথা আবার নতুন করে কানে বাজছে এখন। টাইপরাইটারটা একবার কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে ঠেলে দিলো সে। হঠাৎ সামনে টেবিলের উপর বিছানো কাগজের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল কাসেদ।

জাহানারার নাম লিখে সম্পূর্ণ কাগজটা ভরিয়ে তুলেছে সে।

চারপাশে দ্রুত তাকিয়ে নিয়ে একটা কলম দিয়ে ধীরে ধীরে নামগুলো কেটে ফেললো সে।

কাটতে গিয়ে একটুখানি ম্লান হাসলো সে।

ওর জীবনে থেকেও জাহানারার নামটাকে হয়তো এমনি করে কেটে ফেলতে হবে একদিন।

অফিস থেকে বেরুবার আগে মন স্থির করে নিয়েছিলো কাসেদ। বিকেলে যাবে জাহানারার ওখানে। কাল যে ভুল বুঝাবুঝির মধ্য দিয়ে সে চলে এসেছে তা দূর করে আসবে আজ।

যে কথাটা এতদিন বলে নি, বলতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। আজ সে কথাটা ওকে খুলে বলবে সে। হয়তো শুনে হাসবে জাহানারা। শব্দ করে হেসে উঠবে, তবু বলবে কাসেদ।

যা হবার হোক।

জীবনে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে।

জাহানারাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো কে জানে হয়তো আজ এখানে এই শেষ আসা।

বুড়িটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলো। ডেকে এনে ওকে বসালো ভেতরে। বললো, বয়েন, উনি উপরে আছেন, খবর দিই গিয়া। বলে সে চলে গেলো ভেতরে। সেই যে গেলো অনেকক্ষণ আর তার দেখা নেই, একা ঘরে বসে বসে ক্লান্তিবোধ করলো সে। উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক পায়চারী করলো। বসলো, আবার উঠে দাঁড়ালো।

জাহানারা এলো না, এলো সেই বুড়ি। ওর মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শুধালো, আপনার নাম কি?

কাসেদ নাম বলতে আবার ভেতরে চলে গেলো বুড়ি।

আবার সব চুপ।

অনেকক্ষণ হলো কারো আসার লক্ষণ দেখা গেলো না।

চোখ মেলে প্রতিনিয়ত দেখা দেয়াল আর কড়িকাঠগুলো দেখতে লাগলো কাসেদ।

কিভাবে জাহানারার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, মনে মনে একবার তার মহড়া করে নিলো।

তবু কেউ আসে না।

অবশেষে এল।

জাহানারা নয়। বুড়িটিও নয়। ওদের বাচ্চা চাকরটা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

চাকরটা মৃদু হেসে বলল, আপাজানের শরীর খারাপ, আজ দেখা হবে না। অন্যদিন আসতে বলেছে।

শরীর খারাপ বলে নিচে নেমে এসে একবার কাসেদের সঙ্গে দেখাও করতে পারলো না জাহানারা? এর আগে জ্বর নিয়েও ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে সে, কাসেদ নিষেধ করলেও আমল দেয়নি।

আর আজ!

কথাটা সহসা বিশ্বাস হতে চাইলো না ওর।

চাকরটা মৃদু হেসে চলে গেলো ভিতরে।

হাসলো না, যেন বিদ্রুপ করে গেলো ওকে।

আবার একা।

ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করলো কাসেদ। ভালো লাগছে না, বারবার করে মনে হলো, জাহানারা আজ ইচ্ছে করে অপমান করলো তাকে। সে কোন অপরাধ করে নি তবু তাকে শাস্তি দিলো জাহানারা। কাসেদের মনে হলো পুরো দেহটা জ্বলছে ওর।

অপমান আর অনুশোচনার তীব্র জ্বালা যেন পাগল করে তুলেছে তাকে। কেন ওকে ভালবাসতে গেল সে!

সামান্য ভদ্রতা আর সহজ মানবিক বৃত্তিগুলোও হারিয়ে ফেলেছে জাহানারা। অতি নিচে নেমে গেছে সে।

ওর তুলনায় সালমা অনেক বড়ো। অনেক উদার মনের মেয়ে সে। দেখতে শুনতেও সে খারাপ নয়। প্রাণভরে কাসেদকে ভালবাসতো সালমা। মুহূর্তের জন্যে কাসেদের মনে হলো সালমার ডাকে সেদিন সাড়া না দিয়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে।

আর শিউলি?

শিউলির কথা মনে হতে কাসেদের মনে পড়লো, সন্ধ্যার আগে আগে শিউলি ওর জন্যে অপেক্ষা করবে বলেছে নিউমার্কেটের মোড়ে।

শিউলির পাশে জাহানারাকে আজ অনেক ছোট মনে হলো কাসেদের। শিউলির হাসি। কথা। আলাপের ভঙ্গী আর বাচ্চা মেয়ের মতো ব্যবহার সব সুন্দর। অন্তত জাহানারার চেয়ে।

সন্ধ্যার স্বল্প আলোয় শিউলিকে ছায়ার মত মনে হলো।

রাস্তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে সে।

উচ্ছ্বাস নেই। উচ্ছ্বলতা নেই।

মৃদু হেসে শুধু শুধালো, এলেন তাহলে? ভেবেছিলাম হয়তো আর আসবেন না।

কাসেদ বললো, আমি তো না করি নি।

ওর এলোমেলো চুল, ছন্নছাড়া দৃষ্টি আর ক্লান্ত মুখের দিকে সন্ধানী চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শিউলি।

কাসেদ ম্লান গলায় জিজ্ঞেস করলো, অমন করে কি দেখছেন?

হাতের ব্যাগটা এ হাত থেকে অন্য হাতে সরিয়ে নিতে নিতে শিউলি বললো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছেন।

কাসেদ বললো, অনেকটা তাই।

শিউলি বললো, তার মানে?

কাসেদ বললো, লড়াই শুধু রাজার সঙ্গে রাজার, এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরই হয় না। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মনেরও লড়াই হয়।

শিউলি মুখ টিপে হাসলো, তার মানে আপনি এতক্ষণ অন্য একটি মনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন, তাই না? শিউলি থামলো। থেমে আবার বললো, সে মনটি কার জানতে পারি কি?

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সে মনও আমার। আমার নিজের। একজন চায় স্বার্থপরের মত শুধু পেতে। অন্যজন পেতে জানে না, জানে শুধু দিতে। বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার আনন্দ।

শেষেরটাকেই আমার ভালো লাগে। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে শিউলি বললো, আমার আপনার মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় মিল আছে।

কোথায়? আস্তে করে শুধালো কাসেদ।

শিউলি মিষ্টি করে বললো, তা তো জানি না।

ওর শান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বড় ভালো লাগলো কাসেদের। মৃদু গলায় সে বললো, একটা কথা বলবো মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি।

কি কথা? শিউলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

কাসেদ কি ভেবে শুধালো, আপনি কেন ডেকেছিলেন তাতো বললেন না। কেন ডেকেছি তাতো আমি নিজেও জানি না। শুধু জানি ডাকতে ইচ্ছে করছিলো। হয়তো কিছু বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু– সহসা চুপ করে গেলো শিউলি।

কাসেদ বললো, আমি কিন্তু বলবো বলেই এসেছি।

বলুন।

চলুন আমরা দু'জনে বিয়ে করি। এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে ফেললো কাসেদ। সে কথাটা জাহানারাকে বলার জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করছিলো, সে কথাটা শিউলিকে মুহূর্তেই বলে দিলো সে।

শিউলি চমকে উঠলো।

দু'জনে নীরব।

কারো মুখে কথা নেই।

কাছে, দূরে অনেক লোক। হাঁটছে। হাসছে। কথা বলছে। চিৎকার করে ডাকছে একে অন্যকে। তবু মনে হলো গোরস্তানের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে চারপাশের মুখরতাকে।

শিউলির ঠোঁটের একটি কোণে এক সুতো হাসি জেগে উঠলো সহসা। সে হাসি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। তার পুরো ঠোঁটে, চিবুকে, চোয়ালে, চোখে, সারা মুখে।

মুহূর্তে শব্দ করে হেসে উঠলো শিউলি। আপনি কি আজ অসুস্থ?

না। মোটেই না।

তাহলে এসব কি বলছেন?

যা তুমি চাও, আজ সকালেও চেয়েছিলে, আমি তাই বলছি শিউলি।

শিউলি আবার হাসলো, মনে হচ্ছে আমার চাওয়া না চাওয়া সবটুকুই আপনি জানেন।

আজকের সকালটা যদি মিথ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে বলবো জানি এবং সবটুকুই জানি।

আর আমি বলি আপনি কিছুই জানেন না। শিউলি গম্ভীর হয়ে এলো। মুখে এখন হাসির চিহ্নটুকুও নেই। ম্লান গলায় সে বললো, আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ চিনতে পারলো না।

কেন জানি না, সবাই ভুল বোঝে আমায়। হয়তো এই আমার ভাগ্যে লেখা ছিলো।

এসব কি বলছো শিউলি?

কাসেদ অবাক হলো, কথা বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো ওর।

শিউলি বললো, আপনাকে অন্য আর পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন মনে করতাম বলেই হয়তো এতো সহজভাবে মিশতাম। কিন্তু– বলতে গিয়ে থামলো সে। কপালে ভাঁজ ফেলে কি যেন ভাবলো, ভেবে বললো, আপনিও শেষে ওদের মতো হয়ে যাবেন এ আমি ভাবিনি কোন দিন।

কাসেদের বুঝতে আর বিলম্ব হলো না সন্ধেবেলার এই শিউলির সঙ্গে সকালের সেই শিউলির কোন মিল নেই। এরা যেন দু'টি ভিন্ন মেয়ে। সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু কেন?

কেন এমন হলো?

শিউলি!

বলুন।

একটি দিনের মধ্যেই কি মানুষ এত বদলে যেতে পারে?

আমিও তাই ভাবছি। সকালের সঙ্গে বিকেলের আপনার যেন কোন মিল নেই।

আর তুমি? তুমি কি সেই সকালের মেয়েটি আছো?

আমি? আমার কথা বাদ দিন। আমি যে কখন কি অবস্থায় থাকি, সে আমি নিজেও জানি না।

বাহ্ চমৎকার।

কাসেদের দিকে চমকে তাকালো শিউলি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমার দিক থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে আমি মাফ চাইছি কাসেদ সাহেব।

সত্যি আমি অপারগ, নইলে–।

কথাটা শেষ করলো না সে।

কাসেদের মনে হলো শিউলি হাসছে।

তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে ঠোঁটের কোণজোড়া জ্বলছে ওর।

কাসেদ হেরে গেলো।

প্রথম পরাজয়ের গ্লানি মুছে যাবার আগেই দ্বিতীয় বার পরাজিত হলো সে। নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো ওর। আগুনে হাত বাড়ালে পুড়বে জানতো।

তবু কেন সে এমন করলো?

রাত বাড়ছে।

রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

আরো অনেক ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে শিউলি।

শিউলি আর জাহানারা, ওরা দুই নয়, এক।

একের এপিঠ আর ওপিঠ।

বাসায় ফিরতে অনেক রাত হলো ওর।

খালু এসে দরজা খুলে দিলেন।

এত রাতে তাঁকে দেখে অবাক হলো কাসেদ। মুখখানি ক্লান্ত আর বিমর্ষ।

কোন প্রশ্ন করার আগে খালু চাপাস্বরে বললেন, তুমি এসেছো? এসো. শব্দ করো না।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের সবটুকু দেখতে পেলো কাসেদ। মা বিছানায় শুয়ে. মাথার একপাশে নাহার বসে। অন্য পাশে খালাম্মা। চাপাস্বরে মাকে কি যেন বলছেন খালা।

খালু বললেন, বড়বু'র শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস আমরা এসেছিলাম, নইলে কি যে হতো, কথা বলতে বলতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা।

মা এতক্ষণে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তাকালেন এবার। বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। নাহার উঠে দাঁড়িয়ে কাসেদকে বসবার জায়গা করে দিলো। মায়ের পাশে এসে বসলো কাসেদ।

রুগ্ন হাতখানা ওর দিকে বাড়িয়ে আস্তে করে বললেন, এসেছিস বাবা। শীর্ণ ঠোঁটে ম্লান হাসলেন তিনি। ফিসফিস করে আবার বললেন, এত রাত হোল কেন তোর? অনিয়ম করে শরীরটাকে তো শেষ করলি বাবা। মায়ের কপালে হাত বুলাতে বুলাতে কাসেদ বললো, তুমি এখন ঘুমোও মা।

মা চুপ করে গেলেন।

খালা একটা শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে খাওয়ালেন তাঁকে।

কাসেদ উঠতে যাচ্ছিলো, শার্টে টান পড়ায় আবার বসে পড়লো।

মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়? আমার পাশে বোস।

আর কোন কথা বললেন না মা। নীরবে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন ওকে।

রাত বেড়ে চললো।

আরো, রাত হলে পরে, মাকে দেখাশোনার ব্যাপারে প্রচুর উপদেশ দিয়ে খালা খালু বিদায় নিলেন।

নিজের ঘরে এসে নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেদ।

বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ।

আকাশ-পাতাল অনেক ভাবলো। কি যে ভাবলো সে নিজেও বলতে পারে না।

মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে।

নাহার এসে দাঁড়ালো দরজায়।

মা ডাকছেন আপনাকে।

হুঁ। কাসেদ উঠে দাঁড়ালো।

মা শান্তভাবে শুয়ে আছেন বিছানায়। দেহটা সাদা লেপে ঢাকা। একটুও নড়ছেন না তিনি।

কাছে আসতে মা বললেন, বোস, তোকে কতগুলো কথা বলার জন্যে ডেকেছি। কাসেদ বললো, একি কথা বলার সময় মা, তোমার এখন ঘুমোনো উচিত। নইলে শরীর খারাপ করবে যে।

মা ম্লান হাসলেন, বললেন, শরীর আমার ঠিক আছে বাবা। বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছিলো। আঁচল দিয়ে সেগুলো মুছে নিয়ে বললেন– একটা কথা মনে রাখিস, খোদা আমাদের এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মারা যাবার পরে আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। খোদা তাদেরই ভালো চোখে দেখেন যারা ধর্মকর্ম করে। কোরান-হাদিস মেনে চলে। তোর বাবা– বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো তাঁর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোর বাবা এসব কোনদিনও মানেননি। তুই তাঁর মত হবি আমি চাই নে। আবার থামলেন মা। কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, দুনিয়াটা কিছু না বাবা, এখানে লোভ করতে নেই, তাহলে আখেরে ঠকতে হয়।

মায়ের গলার স্বরটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে।

কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে।

নাহার পায়ের কাছে বসে।

কাসেদ তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো, তুমি এখন চুপ করো মা, ঘুমাও।

মা শুনলেন কিনা বোঝা গেলো না। অন্যমনস্ক চোখজোড়া কড়িকাঠ থেকে নামিয়ে এনে তিনি বললেন, আরেকটা কথা বাবা, আমি যখন মারা যাবো তখন লক্ষ্য রাখিস আমি যেন কলেমা পড়তে পড়তে মরি। আর আমি মরে গেলে, কবর দেবার সময় বাইরের কোন লোককে আমায় দেখাসনে বাবা। মা থামলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ঘামানোর পর এখন ঘাম একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। গায়ের লেপটা টেনে নিতে নিতে ক্লান্ত স্বরে মা বললেন, যাও বাবা, এবার তুমি ঘুমোও গিয়ে।

কিন্তু ঘুমোনো হলো না তার।

ভোররাতের দিকে ঈষৎ তন্দ্রায় চোখজোড়া জড়িয়ে এসেছিলো। নাহারের ডাকে চমকে জেগে গেলো সে।

দেখে যান। মা কেমন করছেন। নাহারের কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠায় ভরা। কাসেদের বুকের ভেতরটা আতঙ্কে মোচড় দিয়ে উঠলো।

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে মায়ের ঘরে গেলো সে।

সেই মাঝরাতে যেমনি ছিলেন তেমনি শুয়ে মা।

চোখজোড়া খোলা, কড়িকাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। কাসেদ সামনে এসে দেখলো দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে।

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন মা।

শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু কোন কথা বেরুচ্ছে না, শুধু একটা কর্কশ আওয়াজ বেরুচ্ছে ভেতর থেকে। কাসেদ ডাকলো, মা!

মা আবার চেষ্টা করলেন কিছু বলতে। বলতে পারলেন না।

অসহায়ের মত চারপাশে এক পলক তাকালো কাসেদ। সহসা দেহটা কেঁপে উঠলো তার। ভয় করতে লাগলো।

একটা বাটি থেকে মায়ের মুখে এক চামচ পানি তুলে দিতে দিতে নাহার কাঁপা গলায় বললো, মা কলেমা পড়, মা কলেমা পড়।

হঠাৎ মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো কাসেদ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সেও বললো, মা শুনছো? মা কলেমা পড়ো, মা গো।

কিছু বলবার জন্যে মা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

নাহার বললো, মা কলেমা পড়ো।

কাসেদ বললো, মা, মাগো, কলেমা।

সহসা মায়ের কণ্ঠ শোনা গেলো। মা বললেন, বাবা আমি চললাম, তোরা সাবধানে থাকিস।

মা চুপ করে গেলেন।

চামচে করে দেয়া পানি মুখ থেকে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

মা, মাগো, বলে নাহার চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

কাসেদ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো বিছানার পাশে। বাইরে রাত ভোর হচ্ছে এখন।

একটু আগে এখানে তিনটি প্রাণী ছিলো।

এখন দু'টি। একটি হারিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে।

কাসেদ কাঁদলো না। কান্না এলো না তার। হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেছে সে।

আজ সকালে খালু এসে নাহারকে নিয়ে গেছেন ওদের বাড়িতে। কাল ওর বিয়ে।

মা মারা যাবার পর ক'দিন মেয়েটা একটানা কেঁদেছে। শেষের দিকে শুধু চোখ দিয়ে পানি ঝরতো কোন আওয়াজ বেরুতো না।

মায়ের শূন্য বিছানার পাশে বসে বসে কি যেন ভাবতো সে।

আজ সেও চলে গেছে।

যাবার আগে পা ছুঁয়ে সালাম করে গেছে তাকে।

বলেছে, ছোট্ট করে বলেছে, যাই।

এখন এ বাড়িতে কাসেদ একা।

চারপাশটা কেমন ফাঁকা লাগছে ওর।

মনটা শূন্য।

সারাদিন বাইরে বেরুলো না কাসেদ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটালো। একবার এপাশ আর একবার ওপাশ। আর সারাক্ষণ অনেক কিছু কথা ভাবলো সে। অনেকের কথা মনে পড়লো।

মায়ের বড় ইচ্ছে ছিলো জাহানারাকে বউ করে আনবে ঘরে। মুখ ফুটে কোনদিন না বললেও বেশ বুঝতে পারতো কাসেদ। মায়ের ইচ্ছাটা গোপন ছিলো না।

কিন্তু জাহানারা?

থাক, যার নাম জীবন থেকে মুছে গেছে তাকে স্মৃতির পাতায় ঠাঁই দিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। ওকে নিয়ে অনেক ভেবেছে কাসেদ। শিউলিকে নিয়েও কম ভাবেনি সে। দুই দেহ, এক মন। মেয়ে জাতটাই বোধ হয় অমনি।

না, তা নয়? সালমা তো ওদের মত নয়। আর মকবুল সাহেবের মেয়ে? কত শান্ত, কত সরল। বড় সাহেবের জীবনটাকে কি সুন্দর করে তুলেছে সে। ওরা কত সুখী।

না, কাসেদ বিয়ে করবে না।

একা থাকবে।

মাঝে একটু তন্দ্রা এসেছিলো। একটা বড় ইঁদুরের কিচ কিচ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেলো ওর। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে।

খোলা জানালা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। কাসেদ বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে সরে গেলো। বাইরের আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে।

কোথাও মেঘের রঙ কালো, কোথাও সাদা, কোথাও ঈষৎ লাল। এখন শেষ বিকেল।

লাল সূর্যটা হারিয়ে গেছে উঁচু উঁচু দালানের ওপাশে। ওটাকে এই জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার শেষ আভাটুকু বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আকাশে ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে দূরের দিগন্তে কোথাও যেন আগুন লেগেছে। তার উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে টুকরো টুকরো মেঘগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আরেক দিগন্তের দিকে।

বাতাস বইছে জোরে।

পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেয়া কুমারী মেয়ের হাল্কা নীল শাড়িখানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে পতপত করে।

আরো দূরের আকাশে একটা চিল একা একা ঘুরছে। শেষ বিকেলের সোনালি আভায় মসৃণ পাখাটি চিকচিক করছে তার।

পুরো শহরটা একটা থমথমে ভাব নিয়ে রাত্রির অপেক্ষা করছে। সহসা বাইরের দরজায় কড়াটা নড়ে উঠলো।

একবার।

দু'বার।

তিনবার।

কাসেদ ঠিক ভেবে উঠতে পারলো না এ সময়ে তার কাছে কে আসতে পারে। মা মারা যাবার প্রথম দু'দিন আত্মীয়-স্বজন অনেকে দেখা করতে এসেছিলো। আজকাল তারা আসে না।

তবে কে আসতে পারে এমনি বিকেলে?

দরজাটা খুলে দিতে কাসেদ অবাক হয়ে দেখলো নাহার দাঁড়িয়ে। এক হাতে খোলা কপাটটা ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

পরনের সাদা শাড়িটায় হলুদ মাখানো। হলুদ ছড়ানো সারা দেহে তার। হাতে মেহেদি, গাঢ় লাল।

কাসেদ বিস্মিত গলায় বললো, একি নাহার তুমি!

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ভেতরে এলো নাহার। তারপর আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, এতকাল যার সাথে ছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বলে চলে এসেছি। যেতে বলেন তো আবার ফিরে যাই।

কাসেদ বিস্ময় বিমূঢ় স্বরে বললো, কাল তোমার বিয়ে আর আজ হঠাৎ এখানে চলে আসার মানে?

নাহার নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে।

কার সাথে? কাসেদ চমকে উঠল যেন।

ক্ষণকাল ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নাহার। তারপর অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললো, যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই। কাসেদ বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেলো না, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে?

পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে সে শুধু মৃদু গলায় বললো, চলো, ও ঘরে চলো।